বিল্‌স শ্রম সংবাদ

নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৮

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

সম্পাদকীয়

যেকোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে সে দেশের শিল্পের উপর নির্ভরশীল। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শিল্প বা আরএমজি। দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করতে পোশাক শিল্পের যেমন কোনো বিকল্প নেই, তেমনি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও এই শিল্পের ওপরই নির্ভরশীল। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের খ্যাতি এখন বিশ্বজোড়া।

এ শিল্প খাতে ৪০ লাখের বেশি শ্রমিক কর্মরত, যাদের মধ্যে ৮০ শতাংশের অধিক নারী শ্রমিক। এ শিল্প একদিকে যেমন দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করছে, অন্যদিকে শিল্পটির মাধ্যমে বেকার সমস্যা বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে খাতটির অবদান অশেষ।

সম্প্রতি তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য মূল মজুরি ৪ হাজার ১০০ টাকা ধরে ৮ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করেছে সরকার। তবে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় এই মজুরি বাস্তবসম্মত নয় বলে মনে করছেন শ্রমিক নেতারা। একইসঙ্গে ঘোষিত মোট মজুরির সঙ্গে মূল মজুরি চাতুরি করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও তাদের অভিযোগ। তাই গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ডের দেওয়া মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বেশিরভাগ শ্রমিক সংগঠন। বেশ কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন ইতিমধ্যে এ বিষয়ে বিবৃতিও দিয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকদের মজুরি ১৬০০০ টাকা করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে।

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণায়ও এ বিষয়টি উঠে এসছে যে গার্মেন্টস শিল্পের একজন শ্রমিক সারা মাস কাজ করে যে বেতন পান, তা দিয়ে তার প্রয়োজনের ৪৭ শতাংশের বেশি মেটানো সম্ভব হয় না। আর শ্রমিকরা বলছেন, একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ৪ থেকে ৫ জনের একটি সংসারের প্রকৃত চাহিদা মিটিয়ে ন্যূনতম চিকিৎসা ও সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় মেটাতে প্রয়োজন কমপক্ষে ১৬ হাজার টাকা। অথচ একজন শ্রমিকের মাসিক বেতন ওভারটাইমসহ পুরো মাসের আয় ১০ হাজার টাকার বেশি নয়। এই টাকা দিয়েই চলতে হয় একজন শ্রমিককে। মালিক পক্ষ শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির বিষয়টি পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নিবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

নভেম্বর মাসে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন উদোগ্য গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা, রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাজশাহীতে স্থাপন করা হচ্ছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইনস্টিটিউট। বিল্‌স এর উদ্যোগেও এসময় আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রকাশনাটির মুদ্রণ সহযোগিতার জন্য এফইএস ঢাকা অফিস এবং অন্যান্য সহযোগিতার জন্য এলওএফটিএফ কাউন্সিল ও মনডিয়াল এফএনভি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা
সম্পাদক

বিল্‌স শ্রম সংবাদ
নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৮

সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান
মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিল্‌স
নজরুল ইসলাম খান, মহাসচিব, বিল্‌স

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ
মেসবাহউদ্দীন আহমেদ
রায় রমেশ চন্দ্র
অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম
শহীদুল্লাহ চৌধুরী
রওশন জাহান সাথী

সম্পাদক
মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সহযোগী সম্পাদক
ফারিবা তাবাসসুম

সহকারী সম্পাদক
মামুন অর রশিদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ
তৌহিদ আহমেদ

মুদ্রণঃ
প্রিন্ট টাচ
৮৫/১, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইলঃ reza@bornee.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়িঃ ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইলঃ bils@citech.net
ওয়েবঃ www.bilsbd.org

সূচী

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি	৪
শ্রমিকের জন্য হচ্ছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইনস্টিটিউট	৯
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিঃ প্রত্যাশা ও বাস্তবতা	১০
সরকারি খাতে সবচেয়ে কম কর্মসংস্থান বাংলাদেশে	১৬
শিশুশ্রম দূর করতে একযোগে কাজ করার তাগিদ	১৭
সবার জন্য উন্মুক্ত মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার	১৮
কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সহিংসতা প্রতিরোধে উচ্চতর প্রশিক্ষণ	১৯
গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত	২০
শ্রম ইস্যুতে নিয়মিত পাঠচক্র অনুষ্ঠিত	২১
রিক্সা-ভ্যানচালকদের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণী কর্মশালা	২২
তাজরীন অগ্নিকান্ডের ৬ বছর স্মরণ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা সভা	২২
মালিক-শ্রমিক-সরকারের সমন্বিত কার্যক্রমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয় : মেয়র নাছির	২৩
বিল্‌স এর আসন্ন কার্যক্রম	২৪
তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকান্ডের ছয় বছর: আহত শ্রমিকদের অবস্থা	২৫
চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৯ শতাংশ	২৮
পেশা পরিচিতি: পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক	২৯
সংগঠন পরিচিতি: ডিজিবি বিল্ডার্সউইর্ক বান্ড	৩১
ট্যানারি শিল্পনগরী ও দুই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের উদ্বোধন	৩১
শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ	৩২

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন:

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ৮ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করেছে সরকার। এর মধ্যে মূল মজুরি ৪ হাজার ১০০ টাকা। বাড়িভাড়া ২০৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৬০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৬৫০ টাকা এবং খাদ্য ভাতা ৯০০ টাকা ধরে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়। মজুরি বোর্ড ডিসেম্বর থেকে নতুন কাঠামো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। এ লক্ষ্যে শিগগিরই শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে বেতন স্কেল চূড়ান্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু। প্রসঙ্গত, বর্তমানে এ খাতে সর্বনিম্ন মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা। নতুন মজুরি কাঠামোয় ২ হাজার ৭০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মজুরি বাড়ানোসহ বেশ কিছু দাবি আদায়ে গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আশুলিয়ার কয়েকটি কারখানার পোশাক শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করেন। একপর্যায়ে আন্দোলন আশপাশের অন্যান্য কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন সরকার, মালিক ও শ্রমিক নেতারা উদ্যোগ নিয়েও কোনো সমাধান করতে পারেননি। আন্দোলন থামাতে ৫৯টি কারখানা বন্ধ করে দেয় পোশাক কারখানা মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। একই সঙ্গে নয়টি মামলা করেন কারখানার মালিক ও পুলিশ প্রশাসন। এসব মামলায় শ্রমিকনেতাসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ছাড়া দেড় হাজারের বেশি শ্রমিককে ছাঁটাই করে কয়েকটি কারখানা। চার দিন বন্ধ থাকার পর কারখানা খুলে দেওয়া হলেও এখনো শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি।

এরপর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চাপে সরকার গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করে। সিনিয়র জেলা জজ সৈয়দ আমিনুল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে স্থায়ী চার সদস্যবিশিষ্ট মজুরি বোর্ডের অন্য সদস্যরা হলেন মালিকপক্ষের প্রতিনিধি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের শ্রম উপদেষ্টা কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ, শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি ফজলুল হক মন্টু এবং নিরপেক্ষ প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন।

এছাড়া মজুরি বোর্ডে মালিক পক্ষের প্রতিনিধি বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন জাতীয় শ্রমিক লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শামসুন্নাহার ভূঁইয়া।

শ্রমঘন পোশাক খাতের মজুরি বোর্ড গঠন করা হয় চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি। বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৯ মার্চ। সেই সভায় মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষকে বলা হয় দ্বিতীয় সভার আগে নতুন মজুরি কাঠামোর প্রস্তাবনা জমা দিতে। প্রথম সভার সাড়ে তিন মাস পর ৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সভা। ওই সভায় শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষ নতুন কাঠামো নিয়ে প্রস্তাবনা জমা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। এ অবস্থায় ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে প্রস্তাবনা জমা দেয়ার সময় নির্ধারণ করে মজুরি বোর্ড।

১৬ জুলাই বোর্ডের তৃতীয় সভায় মালিক পক্ষ নতুন কাঠামোয় নিম্নতম মজুরি প্রস্তাব করে ৬ হাজার ৩৬০ টাকা। আর শ্রমিক পক্ষের প্রস্তাব ছিল ১২ হাজার ২০ টাকা। চতুর্থ সভায় দুপক্ষের প্রস্তাবনার দূরত্ব কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সময় উভয়

পক্ষের সম্মতিতে ১২ সেপ্টেম্বর পঞ্চম সভার তারিখ নির্ধারণ হলেও পরে তা বাতিল হয়। একদিন পর গত ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত মজুরি বোর্ডের পঞ্চম সভা শেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এতে পোশাক খাতের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় ৮ হাজার টাকা। এরপর ৮ অক্টোবর খসড়া সুপারিশের প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।

খসড়া অনুযায়ী ১০ হাজার ৪৩৬ টাকা মূল মজুরি ধরে গ্রেড-১ এর কর্মীদের মোট মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ হাজার ৫০৪ টাকা। গ্রেড-২ এর ক্ষেত্রে মূল মজুরি ৮ হাজার ৫১৪ টাকা, মোট মজুরি ১৪ হাজার ৬২১ টাকা। ৫ হাজার ১৫২ টাকা মূল মজুরি ধরে গ্রেড-৩ এর মোট মজুরি ৯ হাজার ৫৭৮ টাকা। ৪ হাজার ৯৩০ টাকা মূল মজুরি ধরে গ্রেড-৪ এর মোট মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ হাজার ২৪৫ টাকা। ৪ হাজার ৬৭০ টাকা মূল মজুরি ধরে গ্রেড-৫ এর মোট মজুরি ধার্য হয়েছে ৮ হাজার ৮৫৫ টাকা। গ্রেড-৬ এর মোট মজুরি ৮ হাজার ৩৯৯ টাকা, যার মধ্যে মূল মজুরি ৪ হাজার ৩৬৬ টাকা।

সর্বনিম্ন গ্রেড-৭ এর মোট মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে মূল মজুরি ৪ হাজার ১০০ টাকা। বাড়ি ভাড়া ২ হাজার ৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৬০০ টাকা, যাতায়াত ৩৫০ এবং খাদ্য ভাতা ৯০০ টাকা। সব মিলিয়ে মোট মজুরি ৮ হাজার টাকা। ২০১৩ সালের নিম্নতম মোট মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকার চেয়ে যা ৫১ শতাংশ বেশি। এছাড়া শিক্ষানবিশ শ্রমিকের মোট মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার ৯৭৫ টাকা।

ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান জ্যেষ্ঠ জেলা জজ সৈয়দ আমিনুল ইসলাম বলেন, মজুরি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৈঠকে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের দেয়া মজুরি প্রস্তাবের ব্যবধান কমিয়ে আনার কথা বলা হয়। ৫ম বৈঠকে তারা দু'পক্ষই এই সন্তোষজনক অবস্থান ৮০০০ টাকা নির্ধারণে সম্মতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, বোর্ডের সব সদস্য একটা গ্রহণযোগ্য মজুরি নির্ধারণে কাজ করছেন- যাতে শিল্প এবং শ্রমিক সব পক্ষই বাঁচে।

পোশাক ব্যবসার ধরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, তৈরি পোশাক শুধু রপ্তানি আয়ের প্রধান খাতই নয়, একই সঙ্গে ৪৪ লাখ শ্রমিকের রুটি রুজির জায়গা। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করেই এ খাতকে টিকে

থাকতে হয়।

অন্যান্য খাতের তুলনায় মুজরি কম: অন্যান্য শিল্প খাতের তুলনায় গার্মেন্ট শিল্প দ্রুত বর্ধনশীল। জিডিপিতে এই খাতের অবদানও তুলনামূলক বেশি। এই শিল্প থেকেই দেশের ৭৮ ভাগ রপ্তানি আয় হয়। অথচ দেশের উল্লেখযোগ্য ১০টি শিল্প খাতের মধ্যে পোশাক শ্রমিকদের মজুরিই সবচেয়ে কম। তবে ৩ হাজার ৬১ কোটি ডলার বা আড়াই লাখ কোটি টাকা রপ্তানি আয়ের এই খাতের শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি উল্লেখযোগ্য অন্যান্য খাতের তুলনায় বেশ কম।

সম্প্রতি ঘোষিত ট্যানারি শ্রমিকদের মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৮০০ টাকা। এ ছাড়া জাহাজ ভাঙা শিল্পে ১৬ হাজার এবং ওষুধ শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার ৫০ টাকা। চলতি বছরেই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি শতভাগ বৃদ্ধি করে ৮ হাজার ৩০০ টাকা ঘোষণা করেছে সরকার। মজুরির সঙ্গে বাড়ি ভাড়াসহ অন্যান্য ভাতা যোগ করলে মাস শেষে বেতন-ভাতা ১৪ হাজার টাকার বেশি। কিন্তু এই মজুরি কার্যকর হয়েছে ২০১৫ সাল থেকে, ফলে ৮৩০০ টাকার বেসিকের সাথে ৫% ইনক্রিমেন্ট যোগ হবে। এর সাথে অন্যান্য ভাতাদি যুক্ত হয়ে এখন সর্বনিম্ন পাচ্ছে ১৭,৮১১ টাকা।

এ শিল্প খাতে ৪০ লাখের বেশি শ্রমিক কর্মরত। এদের ৮০ শতাংশের অধিক নারী শ্রমিক। এ শিল্প একদিকে যেমন দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করছে, অন্যদিকে শিল্পটির মাধ্যমে বেকার সমস্যা বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে খাতটির অশেষ অবদান রয়েছে।

গত কয়েক বছরের মূল্যস্ফীতিতে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছে শ্রমিক সংগঠনগুলো। তাদের দাবি, তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হতে হবে ১৬ হাজার টাকা। ২০১২ ও ২০১৩ সালে তাজরীন ফ্যাশনসে আগুন এবং সাভারে রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের স্বল্প মজুরির বিষয়টি নতুন করে সামনে চলে আসে। বিদেশি ক্রেতাদের চাপে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রত্যাখান: গার্মেন্টসে ১৮ হাজার টাকা মজুরি ঘোষণার দাবি গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ডের দেওয়া মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বেশিরভাগ শ্রমিক সংগঠন। বেশ কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন ইতিমধ্যে এ বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে। গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি), গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারি ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ), গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ১৬ হাজার টাকা মজুরি ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। এ দাবিতে বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মানবনন্ধন করছে কেউ কেউ। আইবিসি এক বিবৃতিতে বলেছে, মজুরি বোর্ডে শ্রমিক পক্ষের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব না থাকায় শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে না। আইবিসি'র মহাসচিব তৌহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা আগেই আশঙ্কা করেছিলাম মজুরি বোর্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে খাত বহির্ভূত এই ধরণের ব্যক্তিদের দায়িত্ব দিলে শ্রমিক শ্রেনীর স্বার্থের বারোটা বাজবে। সেটাই প্রমাণিত হলো। এ খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকার দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে আরো বলা হয়, অন্যথায় পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা আন্দোলনের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত মজুরি আদায় করে নিবে। আন্দোলনের লক্ষ্যে

শিগগিরই আলোচনা শুরু করা হবে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়।

বিল্‌স এর গোলটেবিল বৈঠক: বিল্‌স এর উদ্যোগে "তৈরী পোশাক শিল্পে মজুরি পর্যালোচনা: বাস্তবতা ও করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ২ অক্টোবর, ২০১৮, রাজধানীর ডেইলি স্টার ভবনের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। পোশাকশিল্পে নিম্নতম মজুরি ঘোষণার বাস্তবতা বিশ্লেষণ ও করণীয় নির্ধারণ করাই ছিল এই গোলটেবিল বৈঠকের মুল উদ্দেশ্য।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে স্কপভুক্ত ও বিল্‌স সহযোগী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, ইন্ড্রাষ্ট্রি-অল বাংলাদেশ কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ, মজুরি বোর্ডের শ্রমিকপক্ষের সাবেক প্রতিনিধিগণ, গবেষক, বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যম সহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সঞ্চালনা করেন বিল্‌স এর যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মোস্তাফিজ আহমেদ।

সভায় জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, ২০১৩ সালে মূল মজুরি বেড়েছে ৫৬ শতাংশ, যা সবচেয়ে কম। আমরা নিম্নতম গ্রেড নিয়ে আলোচনা করলেও অন্যান্য গ্রেড নিয়ে আলোচনা করি না। মূল মজুরি বৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে। অথচ মূল মজুরির ওপর অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই মূল মজুরিকে মানসম্মত পর্যায়ে নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মূল মজুরি ৭০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স লীগের সভাপতি জেড এম কামরুল আনাম বলেন, মজুরি রিভিশনে কোনো সংগঠন পিটিশন করেনি। পোশাক শিল্পের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ শ্রমিক অপারেটর। তাদের মজুরি বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি দরকার। এখনো সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়টি উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন বলেন, মূল মজুরি না বাড়লে ন্যূনতম মজুরিকে সুবিধাজনক পর্যায়ে নেয়া যাবে না। বুলগেরিয়ার মতো দুর্বল অর্থনীতির দেশে পোশাক শ্রমিকের মজুরি ২০০ ডলার হলেও বাংলাদেশে তা ১০০ ডলারে উন্নীত করা যায়নি। গেজেট ঘোষণার আগে দাবিগুলো তুলে ধরা দরকার।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ১২ শতাংশ শ্রমিক মেঝেতে ঘুমায়। ১৭ শতাংশের বৈদ্যুতিক পাখা নেই। ৮৩ শতাংশকে টয়লেট শেয়ার করতে হয়। ৮৪ শতাংশ শ্রমিক একই রান্নাঘর ব্যবহার করে। সিপিডি প্রস্তাবিত মোট মজুরি ছিল ১০ হাজার ২৮ টাকা, মূল মজুরি ৫ হাজার ৬৭০। শ্রমিকের সঞ্চয়ের প্রস্তাবও ছিল। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে উপরের গ্রেডে যেন মজুরি সুষমভাবে বৃদ্ধি হয়। গ্রেড ৮ রয়েছে শিক্ষানবিশ। এ গ্রেডটি থাকার দরকার আছে বলে মনে হয় না। শ্রমঘন এলাকায় বাড়িভাড়া বৃদ্ধি হয় তুলনামূলকভাবে বেশী। এক্ষেত্রে বাড়িওয়ালাকে ঋণ দিয়ে বহুতল ভবন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা যেতে পারে। চিকিৎসা ব্যবস্থা ও স্কুল নির্মাণে এনজিওদের উদ্যোগ নিতে হবে। মজুরি কাঠামো ঘোষণার পর ব্র্যান্ড বায়ারদের প্রতিক্রিয়া জানা দরকার। পোশাক কেনার মূল্য বৃদ্ধি করে মজুরি বাড়ানোয় ব্র্যান্ডগুলোর কোনো উদ্যোগ থাকবে কিনা দেখতে হবে। মজুরি বোর্ডের অবস্থান ও কাঠামো নিয়ে দুর্বলতা রয়ে গেছে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, শ্রমিকের বেতন বেড়েছে ৮ গুণ, রপ্তানি বেড়েছে ৯৮৭ গুণ। কম্বোডিয়ায় মজুরি বেশি। আমাদের সে তুলনায় কম। বিষয়টি মাথায় নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। ভেতরের দুর্বলতা কমানো ও বাইরের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে আন্দোলন এগিয়ে নিতে হবে।

সভায় অন্যান্য বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি যথাযথ হয়নি। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল মজুরির ২০০৬ সালের ৬৭.৬৯ ভাগ থেকে কমিয়ে বর্তমানে ৫১.২৫ ভাগ করা হয়েছে। এতে শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরির সর্বক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলেও এই মজুরি কম বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। বক্তারা উল্লেখ করেন, জাহাজভাঙ্গা, ট্যানারিতে ন্যূনতম মজুরি যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তৈরি পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরি সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। তারা বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ভিশন-২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং সর্বপরি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের একটি দেশে উন্নীত করতে হলে তৈরি পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরিকে একটি মানসম্মত পর্যায়ে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হবার আগে বিষয়টি নিয়ে শ্রমিকপক্ষের অবস্থান সরকারের কাছে জোরালোভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। মূল মজুরির ওপর যেহেতু অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি নির্ভর করে সেহেতু মূল মজুরিকে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মূল মজুরি ৭০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের মধ্যে যে মজুরি বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে ।

প্রতিযোগী দেশের তুলনায় মজুরি কম: বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। আবার কম মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ দ্বিতীয়। শ্রীলঙ্কার শ্রমিকেরা সবচেয়ে কম মজুরি পান, মাসিক ৬৬ মার্কিন ডলার। তারপর বাংলাদেশে ৬৮ ডলার। শ্রমিকের মজুরি সবচেয়ে বেশি তুরস্কে, ৫১৭ ডলার। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) 'বৈশ্বিক পোশাক খাতে নিম্নতম মজুরি-২০১৫' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমনটাই উঠে এসেছে। সেই প্রতিবেদনে শীর্ষ ২০ পোশাক রপ্তানিকারক দেশের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি উল্লেখ ছিল। প্রতিবেদন অনুযায়ী চীনে ন্যূনতম মজুরি ১৫৫ ডলার, ভিয়েতনামে ১০০, ভারতে ৭৮ ডলার, কম্বোডিয়ায় ১২৮, পাকিস্তানে ৯৯ ডলার, ফিলিপাইনে ১৫০ ডলার।

গবেষণা প্রতিবেদন: বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) হিসেবে, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য মূলত তিনটি মডেলকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এর প্রথম মডেলটি হচ্ছে, দারিদ্র্য সীমার ওপরে অবস্থানকারী একজন শ্রমিকের মাসিক খরচের হিসাব বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা। দ্বিতীয় মডেলটি হলো, কাঙ্ক্ষিত পুষ্টি অর্জনের জন্য একজন মানুষের যে সুষম খাবার দরকার, তা বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা। তৃতীয় মডেলটি হলো, শ্রমিকদের বর্তমান জীবনধারণের খরচের হিসাব বিবেচনা করে তার ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা।

সিপিডি বলেছে, দারিদ্রসীমার ওপরের স্তরে অবস্থানকারী প্রায় পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারে 'জাতীয় খানা আয়-ব্যয় জরিপ' অনুযায়ী খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্য ও সেবা কেনার ব্যয় মাসে ৯ হাজার ২৮০ টাকা। পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীকে এক্ষেত্রে আয় করতে হবে ৬ হাজার ৪৪৫ টাকা। সিপিডির হিসেবে পরবর্তী দু'টি মডেলে এই পরিমাণ আরও বাড়ে। কাঙ্ক্ষিত পুষ্টিহার অনুযায়ী খাবার গ্রহণ ও জীবনধারণের জন্য একজন শ্রমিকের প্রতিমাসে ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজন ১৭ হাজার ৮৩৭ টাকা। প্রকৃত খরচ অনুযায়ী বিবাহিত একজন শ্রমিকের মাসে আয় করতে হবে ১০ হাজার ৩৫২ টাকা।

অন্যদিকে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির উদ্যোগে 'কী করে বাঁচে শ্রমিক' শিরোনামে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি দেশের ৬টি শিল্পাঞ্চলে ২০০ শ্রমিকের অংশগ্রহণে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করে গার্মেন্টস সংহতি। প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপে বলা হয়, বাংলাদেশে একজন পোশাক শ্রমিক বেতন, ওভারটাইম, হাজিরা বোনাসসহ মোট ৮ হাজার ২০০ টাকা আয় করেন। প্রতিটি পোশাক শ্রমিকের পরিবারে গড়ে দুজন উপার্জনকারী সদস্য রয়েছেন, চার সদস্যের একটি পরিবারের মোট আয় ১৫ হাজার ৮৬৩ টাকা। ৬১ শতাংশ শ্রমিক মনে করেন, তাঁর আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা সামাল দেওয়ার জন্য গার্মেন্টস শ্রমিকেরা বিভিন্ন উৎস থেকে নিয়মিত ঋণ নেন এবং খাদ্য ও বাসাভাড়া বাবদ ব্যয় কমিয়ে দেন। গড়ে একজন পোশাক শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের পাশাপাশি মাসে গড়ে ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত ওভারটাইম করেন। ফলে শ্রমিকেরা প্রয়োজনীয় ঘুম ও বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত হন।

ইতিহাস: বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সর্বপ্রথম নির্ধারিত হয় ১৯৮৫ সালে। এটি পোশাক শিল্প বিষয়ক প্রথম মজুরি বোর্ড। এ মজুরি বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ছিল ৬২৭ টাকা। পোশাক শ্রমিকদের জন্য দ্বিতীয় মজুরি বোর্ড গঠিত হয় নির্ধারিত পাঁচ বছরের পরিবর্তে নয় বছর পর, ১৯৯৪ সালে। দ্বিতীয় মজুরি বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ছিল ৯৩০ টাকা, যা প্রথম মজুরি বোর্ডের ঘোষিত মজুরির ৪৮

শতাংশের অধিক। পোশাক শ্রমিকদের জন্য তৃতীয় মজুরি বোর্ড গঠিত হয় নির্ধারিত পাঁচ বছরের পরিবর্তে ১২ বছর পর, ২০০৬ সালে। তৃতীয় মজুরি বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ছিল ১ হাজার ৬৬২ দশমিক ৫০ টাকা, যা দ্বিতীয় মজুরি বোর্ডের ঘোষিত মজুরির ৭৮ শতাংশের বেশি। চতুর্থ মজুরি বোর্ডটি নির্ধারিত পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে চার বছরের মাথায় ২০১০ সালে গঠিত হয়। চতুর্থ মজুরি বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ৩ হাজার টাকা, যা তৃতীয় মজুরি বোর্ডের ঘোষিত মজুরির ৮০ শতাংশের বেশি। চতুর্থ মজুরি বোর্ডের মত পঞ্চম মজুরি বোর্ডটিও পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তিন বছরের মাথায় ২০১৩ সালে গঠিত হয়। পঞ্চম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা, যা চতুর্থ মজুরি বোর্ডের ঘোষিত মজুরির ৭৬ শতাংশের বেশি।

শ্রমিকের জন্য হচ্ছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইনস্টিটিউট

শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা, রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাজশাহীতে স্থাপন করা হচ্ছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইনস্টিটিউট।

১ নভেম্বর, ২০১৮ রাজশাহী মহানগরীর তেরখাদিয়া এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক চুন্নু।

রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র তেরখাদা এলাকায় ১৯ বিঘা জমির উপর এই ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে ১৬৫ কোটি টাকা। এই ইনস্টিটিউট স্থাপনের ফলে কলকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশের সব শিল্পের জন্যই পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় নিয়ে সরকার ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস পালন করে আসছে।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের পেশাগত অনেক জটিল রোগ হয়। এসব রোগের চিকিৎসা সাধারণ হাসপাতালে দেওয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাও পাওয়া যায় না। এসব পেশাগত রোগ সম্পর্কে গবেষণা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং শ্রমিকদের সচেতনতা বাড়াতে এ ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এসময় তিনি পেশাগত রোগের চিকিৎসায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জে ৩শ' শয্যার একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

মুজিবুল হক বলেন, এ ইনস্টিটিউটে শ্রমিক-মালিক এবং মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও, সুইডেন, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ড সরকার কারিগরি সহায়তা এবং প্রশিক্ষকসহ সার্বিক সহযোগিতায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

তিনি বলেন, শ্রমিক দুর্ঘটনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে এটিই প্রথম ইনস্টিটিউট। আশপাশের দেশগুলোর মধ্যে ভারতে শুধু এধরণের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাকি নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় এধরণের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে এসব দেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য শ্রম সংশ্লিষ্ট লোকজন এখানে প্রশিক্ষণ নেবেন বলে আশা করা যায়।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বলেন, এ ইনস্টিটিউটটি থেকে শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে রাজশাহীর জন্য উন্নয়নের আরও একটি নতুন মাত্রা যোগ হল।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন রাজশাহী-২ (সদর) সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব আশরাফ শামীম, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিবনাথ রায়, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সামছুজ্জামান ভূইয়া, সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান প্রকৌশলী কর্ণেল এবিএম মিজানুর রহমান, রাজশাহী চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ'র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, জাতীয় শ্রমিক লীগ রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সোহেল।

উল্লেখ্য তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় এবং তৈরি পোশাক করাখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল। তাই শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং পেশাগত রোগের বিষয়ে সচেতেনতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই লক্ষ্যে সরকার এধরণের একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিঃ প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

মোস্তাফিজ আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম যে মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে তার জন্য যে বাস্তবতা ও প্রত্যাশা ছিল তা বিশ্লেষণ করা দরকার। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের করণীয় কি সেটাও নির্ধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

কোন প্রেক্ষাপটে এই ৮ হাজার টাকা মজুরি ঘোষণা করা হল সেটা বুঝতে হলে একটু পেছন ফিরে দেখা দরকার। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে শ্রমিকরা যখন মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করলেন এবং সেখানে শ্রমিকরা তাদের ন্যূনতম জীবনমান নির্ধারণের জন্য ১৬ হাজার টাকার দাবি করলেন। এর প্রেক্ষাপটে কারখানা বন্ধ হল, শ্রমিক নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা হল। সার্বিক এই প্রেক্ষাপটটা ছিল ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের প্রথম দিকে প্রায় ১৬০০ শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হল। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে এই ১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবির প্রতি সমর্থন একই সাথে আটক শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য বৈশ্বিকভাবে একটা চাপ তৈরি হল। এর প্রেক্ষাপটে একটা সময় মালিক পক্ষ থেকে বলা হল যে, হ্যাঁ তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তবে চাকরিতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। কতজনকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল সে পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই। এর পরবর্তীতে দেখা যায়, সমস্ত ফেডারেশন এবং গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের জোট ১৬ হাজার টাকা এবং কেউ কেউ ১৮ হাজার টাকার দাবি করলেন। সেই দাবিগুলোও ক্রমশ জনপ্রিয় হওয়া শুরু করল। সার্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে একটি নতুন মোড় দেখা গেল গার্মেন্টস সেক্টরের ক্ষেত্রে। মালিক পক্ষ থেকে মজুরি পুনঃনির্ধারণের জন্য যে প্রস্তাবনা দেওয়া হল সেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা নতুন দিক। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারী প্রথম মজুরি বোর্ড গঠিত হল। বিভিন্ন সংগঠন এবং জোটগুলো তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে মজুরি বৃদ্ধির জন্য মজুরি বোর্ড এর কাছে প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু আগের যে প্রস্তাব সেটা দেওয়ার এখতিয়ার ছিল কেবলমাত্র শ্রমিক প্রতিনিধির (মজুরি বোর্ডের) এবং মালিকপক্ষের প্রতিনিধির। সেই প্রস্তাবটা এলো জুলাই মাসের তৃতীয় বৈঠকে। সর্বশেষ ১৩ সেপ্টেম্বর মজুরি বোর্ড থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিচের স্তর সপ্তম গ্রেডের জন্য ৮০০০ টাকা মজুরির একটা ঘোষণা দেওয়া হল।

২০১৬ থেকে আজকে পর্যন্ত ৮০০০ টাকা মজুরি ঘোষণার যে প্রেক্ষাপট সেই জায়গাগুলোতে আমাদের প্রশ্ন করা দরকার। সকলের কাছে প্রশ্ন মজুরি আদৌ কি বাড়ল? বাড়লে কত টাকা বাড়ল? আমাদের যে দাবি সেই দাবির সাথে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্যতা কতটুকু? বৃদ্ধিকৃত মজুরির সামঞ্জস্যতা কতটুকু? মোটা দাগে হিসাব করলে দেখা যায় যে ৮০০০ থেকে ৫৩০০ বিয়োগ করলে যেটাই বাড়ে সেটাই মজুরি বৃদ্ধি। পত্রপত্রিকাগুলোতে সেভাবেই এসেছে এবং বলা হয়েছে ৫১% মজুরি বেড়েছে। সার্বিকভাবে চিন্তা করলে এটা ২৭০০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি নাকি ৮৯৯৭ টাকা মজুরি বৃদ্ধি? এই প্রশ্ন কিন্তু চলেই আসছে। কারণ ২০১৩ সালে মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং মজুরি বোর্ড এর যে মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা সেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা ছিল যে প্রতি বছর ৫% হারে মজুরি বাড়বে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মজুরি কার্যকর হলে তার পর থেকে সেটা ৫% হারে বাড়তে থাকে। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে যখন থেকে নতুন মজুরি কার্যকর হওয়ার কথা সেই সময় ৭১০২ টাকা মজুরি হওয়ার কথা। সেই হিসেবে মজুরি বৃদ্ধিটা ৮৯৭ টাকার মত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে হিসাবে দেখা যায়। আসলে ৫১% মজুরি বৃদ্ধির বদলে ১২.৬৪% মজুরি বৃদ্ধিই বলাই উচিত। যখনই মজুরির আলোচনা আসে তখনই আমরা শ্রমিক পক্ষ বা শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিদের থেকে জানতে চাই মূল মজুরিটা আসলে কত হবে? আমরা সকলেই জানি যে গার্মেন্টস্ সেক্টরে প্রচুর ওভারটাইম হয়। এবং ন্যূনতম মজুরি যেটা গার্মেন্টস্ সেক্টরে আছে সেটা দিয়ে ন্যূনতম জীবনমান অর্জন সম্ভব হয় না বিধায় শ্রমিকরা ওভারটাইম করতে আগ্রহী হয়। সেখান থেকেই বেসিক এর অনুপাতটা কমে যায়। শ্রমিকের সুবিধা অর্থাৎ ওভারটাইম কাজ থেকে বাড়তি ইনকামের যে সুযোগ সে সুযোগটা তাদের জন্য সীমিত হয়। একই প্রেক্ষাপটে ফল হল দুটো। একটা তাৎক্ষণিক ফল (ওভারটাইম এর উপরে) এবং দীর্ঘমেয়াদী ফল। তার চাকরি শেষে যে সুবিধাগুলো পাওয়ার কথা সেই পরিমানটাও আসলে কমে আসে। সুতরাং মজুরির ক্ষেত্রে মূল মজুরি (গার্মেন্টস্ সেক্টরের জন্যে) একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সেক্ষেত্রে দেখা যায় মজুরি বৃদ্ধি হয়ে হয়েছে ৪১০০ টাকা। বেসিক ৩০০০ থেকে ১১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫% হল গেজেট অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির হিসাব। মুদ্রাস্ফিতি এর দিকে না যাওয়াই ভাল কারন মুদ্রাস্ফিতির হার নিয়ে আমাদের অনেক দ্বিধা আছে। সরকারি পরিসংখ্যান একরকম বেসরকারি পরিসংখ্যান আরেকরকম।

সুতরাং মুদ্রাস্ফিতির পরিসংখ্যানের যে দুরত্ব সেটাকে অতিক্রম করার চিন্তা করে গেজেট অনুযায়ী ৫% মজুরি বৃদ্ধিকেও চিন্তা করলে দেখা যায় যেটা মূল মজুরি সেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৭৯ টাকার মত। মূল মজুরি কিন্তু ২% এর বেশি বৃদ্ধি পায় নি। বাস্তবে ১.৯৯% মূল মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে যদি বিগত কয়েকটি সেক্টরের মজুরি ঘোষণা দেখি তাহলে দেখা যায় যে ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকদের মূল মজুরি কমানোর একটা প্রবণতা আছে। ২০১৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ঘোষিত যে ন্যূনতম মজুরি ৭ম গ্রেডের জন্যে সেটাকে ২০১৩ সালের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এখানে মজুরির বিভিন্ন উপাদান ঠিকই আছে। বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা এবং খাদ্য ভাতা ইত্যাদি জায়গাগুলোতে মূল মজুরি সবচেয়ে কম বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও এটা মুদ্রাস্ফিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ না স্পষ্টত ৩৬%। যেটা বাস্তবে ২%।

তারপরও ৩৬% বেসিক এর জায়গায় খাদ্য ভাতার ক্ষেত্রে ৩৮% এবং চিকিৎসায় ১৪০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূল মজুরি যেভাবে কমে এসেছে তা বিবেচনা করা দরকার। এক্স এক্সিজ এ যে ১,২,৩,৪,৫ সেটা আসলে বছরগুলোকে চিহ্নিত করছে। ১৯৯৪, তারপরে ২০০৬,২০১০,২০১৩,২০১৬। এর মধ্যে ২০০৬ সালে বেসিক এর শেয়ার সবচাইতে বেশি ছিল। মোট মজুরিতে যেটা ৭% এর মত। কিন্তু পরবর্তীতে ২০১০,২০১৩ এবং সর্বশেষ ঘোষিত ২০১৮ এর মজুরিতে কমতে কমতে এখন ৫১% এ নেমে এসেছে। (দ্রষ্টব্য: টেবিল-১)

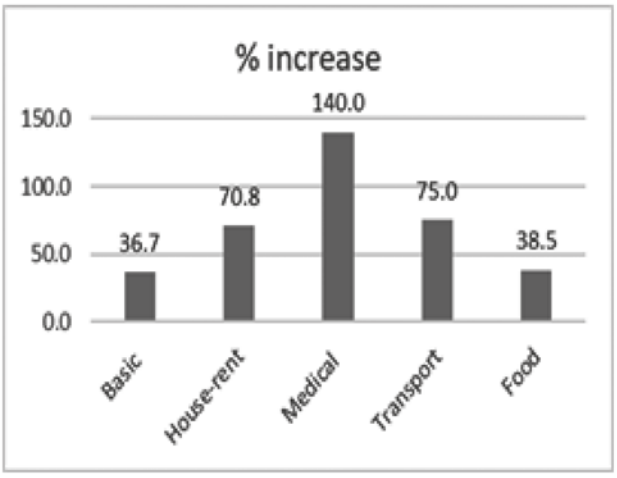

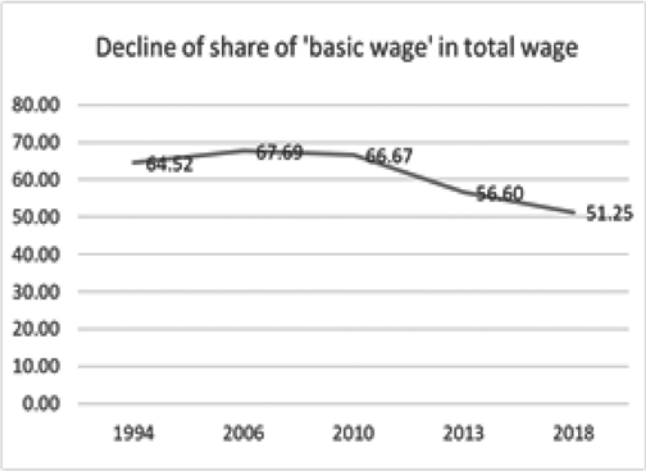

টেবিল-১ (ডেইলি স্টারে ২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিল্স আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত পাওয়ার পয়েন্ট থেকে নেয়া)

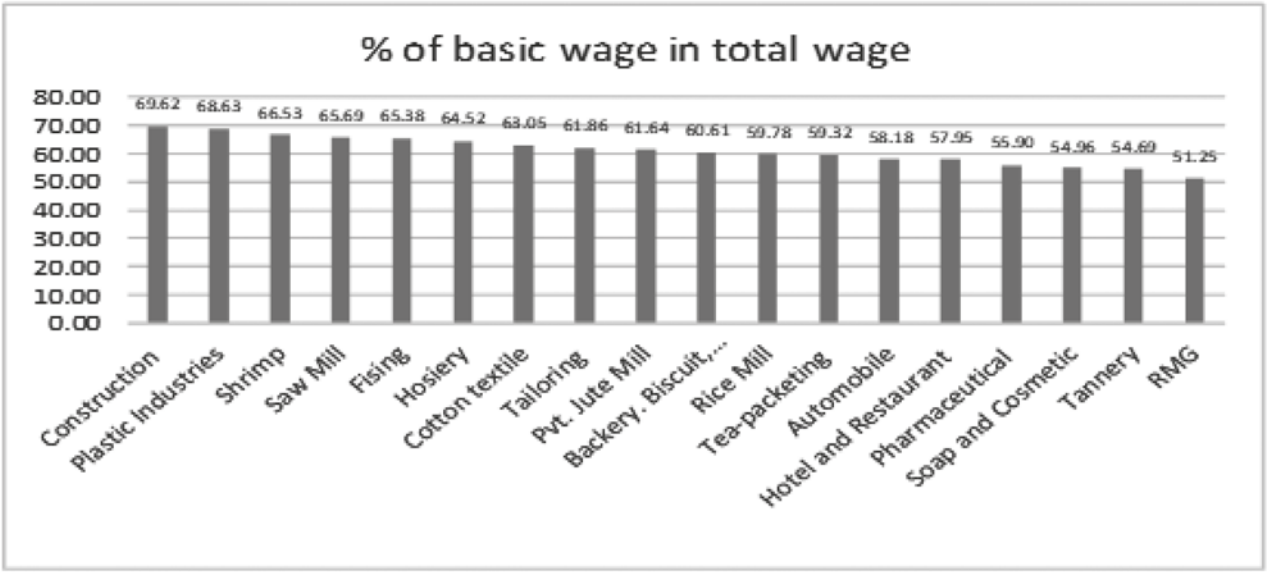

টেবিল-২ (ডেইলি স্টারে ২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিল্স আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত পাওয়ার পয়েন্ট থেকে নেয়া)

রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কলকারখানায় শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি সর্বনিম্ন গ্রেডে যেটি মাত্র ১৪৪৫০ টাকা। ন্যাশনাল পে স্কেলকেও সর্বনিম্ন স্তরে যিনি মজুরি পাচ্ছেন তিনিও ১৪২৫০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। ঘোষিত মজুরিকে এই দুইটি মজুরির সাথে তুলনা করলে দেখা যায় গার্মেন্টস শ্রমিকরা রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কলকারখানার শ্রমিকদের তুলনায় প্রায় ৪৫% মজুরি কম পাচ্ছেন। পে স্কেলের সর্বনিম্ন স্তরে যে মজুরিটা আছে সেই মজুরি থেকে ৪৪% মজুরি কম ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি খাত থেকে বের হয়ে বেসরকারি খাতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেসরকারি খাতের মজুরি ঘোষণার প্রদ্ধতিই হচ্ছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ঘোষিত মজুরিও লক্ষ্য করলে দেখা যায় জাহাজ ভাঙ্গায় ১৬০০০ টাকা এবং ট্যানারি শিল্পে ১২৮০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। এই একই বছরে গার্মেন্টস সেক্টরে ঘোষিত মজুরি ৮০০০ টাকা। অর্থাৎ গার্মেন্টস সেক্টরের সর্বনিম্ন স্তরের শ্রমিকের বেতন জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে যিনি কাজ করবেন তার অর্ধেক। এবং ট্যানারি শিল্পে যিনি কাজ করছেন তার থেকে ৩৭.৫% মজুরি কম ঘোষণা করা হয়েছে গার্মেন্টস শিল্পের জন্যে। (দ্রষ্টব্য: টেবিল-৩)

এখনও পর্যন্ত ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ প্রত্যেকটি দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মজুরি কম। ৮০০০ টাকাকে বিবেচনায় নিয়ে আসলেও সেটি আসলে কতটুকু জীবনযাপনের মান দিতে পারবে? ২০১৭ সালের অক্সফাম এর হিসাব অনুযায়ী জীবন ধারণের মজুরি ধারণার জায়গা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি লিভিং ওয়েজ সবচাইতে কম যেটা ১৮%। শ্রীলংকায় ২০% এবং চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ন্যূনতম মজুরি লিভিং ওয়েজের ৬৬% এবং ৫৩% কাভার করছে। এই ১৮% হিসাবটা ছিল ৫৩০০ টাকা মজুরি হিসাব করে। বর্তমানে ৮০০০ টাকা মজুরিকে বিবেচনায় নিয়ে আসলে এটা গিয়ে দাঁড়ায় ২৭% এ। তারপরও কম্বোডিয়া, ভারত এবং চীনের তুলনায় অনেক কমই হবে বাংলাদেশের মজুরি। যেটা জীবনধারন উপযোগী হিসেবে খুবই প্রয়োজন। (দ্রষ্টব্য: টেবিল-৪)

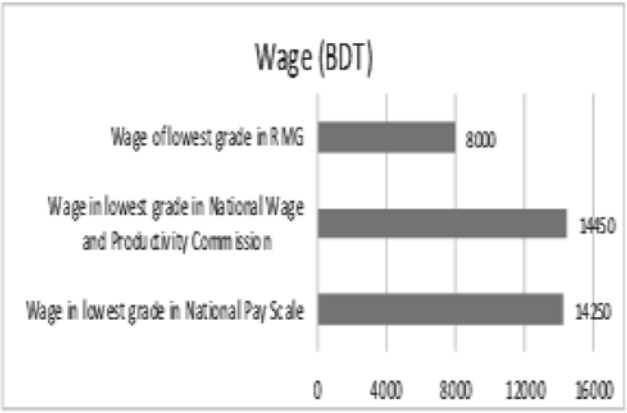

টেবিল-৩ (ডেইলি স্টারে ২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিল্‌স আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত পাওয়ার পয়েন্ট থেকে নেয়া)

টেবিল-৪ (ডেইলি স্টারে ২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিল্‌স আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত পাওয়ার পয়েন্ট থেকে নেয়া)

গার্মেন্টস শিল্পের জন্য ঘোষিত মজুরি এবং অন্যান্য সেক্টরের মজুরির সাথে তুলনা করা দরকার। শ্রমিকের প্রয়োজনকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে বিল্‌স এর জরিপ থেকে আমরা কিছু মজুরির পরিমান পেয়েছি। এই মজুরির পরিমানটা ৫ সদস্যের একটা পরিবারে ন্যূনতম মানসম্মতভাবে বেঁচে থাকার জন্য ৩০২৬৮ টাকা, ৪ সদস্যের পরিবারের জন্যে ২৪৯৬৯ টাকা, শুধু স্বামী-স্ত্রী আছেন এমন দুইজনের জন্যে ১৭১২১ টাকা এবং যে একা শ্রমিক তারও ন্যূনতম ১২৪৩৮ টাকা প্রয়োজন। নারায়নগঞ্জ, টঙ্গী, আশুলিয়া, মিরপুর, এফজিডি বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই তথ্যগুলো পেয়েছি। দেখা যাচ্ছে যে ৮০০০ টাকা যে হিসাব সেই ৮০০০ টাকা একজন শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্যে ৬০%। পরিবারে দুইজন সদস্য থাকলে অর্ধেকেরও কম পূরণ করবে। ৪ সদস্যের পরিবারের ক্ষেত্রে সেটা তিন ভাগের এক ভাগ এবং ৫ সদস্যের পরিবারের জন্যে সেটা আসলে প্রায় ৭০% এবং ৩০% প্রয়োজন পূরণ হবে বর্তমান ঘোষিত মজুরিতে। এ জায়গাতে হয়তো একটা বিভ্রান্তি আছে। পরিবারের সদস্যের হিসাবটা কিভাবে হবে মজুরি হিসাবের জন্য?

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে যাচ্ছে, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি মাথা পিছু আয়ের হিসাবটাও নিয়ে আসা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ১৭৫২ ডলার মাথা পিছু আয় বলা হচ্ছে। সেটা যদি হয় তাহলে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১২২২৭ টাকা। এই টাকাকে যদি গার্মেন্টস শ্রমিকের ঘোষিত মজুরির ৮০০০ টাকার সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সেখানেও দেখা যায় প্রায় ৩৫% কম। মাথা পিছু আয়ের চেয়ে ৩৫% কম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে একজন পরিবারের জন্য। মজুরির জন্যে এমন চিন্তা করতে হবে যেন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো সবই শহর এলাকায়। শহর এলাকার একটা পরিবারের গড় আয় ২২৫৬৫ টাকা। এটাকে যদি ঘোষিত মজুরির সাথে তুলনা করা হয় দেখা যায় যে এটা ৮০০০ টাকা অর্থাৎ প্রায় তিন ভাগের এক ভাগের কাছাকাছি।

সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হল তা বিবেচনা করা দরকার। মজুরি নির্ধারণের কিছু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উপকরণ আছে। যদিও বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন ১৩১ ধারা অনুসমর্থন করে নি তারপরও শ্রম আইন ২০০৬ এ যে সমস্ত নির্ণায়ক নির্ধারণ করা আছে সেই নির্ণায়কগুলো আসলে আইএলও'র যে নির্ণায়কগুলো আছে সেগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে। শুধুমাত্র একটি উপাদান ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টাকে আইএলও সুপারিশে নিয়ে আসা হয়েছে সামাজিক মজুরি নির্ধারনের একটা প্রদ্ধতি হিসেবে। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রম আইনে এই প্রদ্ধতিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। তারপরও শ্রমিকের প্রয়োজন একটি সমাজের যেখানে মজুরি স্তর এবং কস্ট অব লিভিং প্রডাক্টিভিটি এই বিষয়গুলো আইএলও সুপারিশ এবং একই সাথে বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইনে যে উপাদানগুলোর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে জীবনযাত্রার খরচ, উৎপাদন খরচ, উৎপাদণশীলতা, পন্যের দাম, ব্যবসায়ীক ক্ষমতা ইত্যাদি। আসলে মোটা দাগে এই বিষয়গুলোকে যদি তিনটি গ্রুপে ভাগ করা যায় তাহলে কিছু আছে শ্রমিকের প্রয়োজন, কিছু আছে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত এবং বাঁকি যে উপাদান সেটা হচ্ছে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা। মাথা পিছু আয় বাড়ছে কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি সেই গতিতে এগুচ্ছে না। আবার উৎপাদনশীলতার যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়ে দেখা যায় যে এটা সবসময় মজুরি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এরকম উদাহারণও নেই। বলা হচ্ছে যে কম্বোডিয়াতে ২০০০-২০১৩ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৬% এর মত, কিন্তু মজুরি ২০% এর বেশি বৃদ্ধি পায় নি। সুতরাং উৎপাদনশীলতাকে সবসময় যদি গুণক হিসেবে চিন্তা করা হয় তাহলে অনেক সময় পুঁজি আহরণের গড় হিসেবে চলে আসতে পারে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে ১৬০০০ টাকা মজুরির দাবি থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন সংগ্রাম বিভিন্ন গোল টেবিল বৈঠকের বিভিন্ন প্রস্তাবনা সমস্ত কিছু থেকে আজকের এই অর্জন। এগুলো ৮০০০ টাকা মজুরি ঘোষণায় প্রশ্ন উত্থাপন করেছে ।

সুতরাং যে প্রশ্নগুলোর অবতারনা হচ্ছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা খুবই জরুরি। এটা হয়ত এবারের জন্যে চূড়ান্ত কোন সুবিধা দিতে পারবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে যে আন্দোলন, সংগ্রাম, দাবি, সেই সাথে মজুরি বৃদ্ধির যে প্রয়াস সেই জায়গাগুলোতে কার্যকরী অবদান রাখার প্রয়োজন হলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রথমেই আসে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের গঠন প্রক্রিয়া। বিশেষ করে সেক্টর প্রতিনিধি নির্বাচনের যে বিধান আইনে আছে সেটার অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই। এই জায়গাতে অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে "সরকারের মতে" । সুতরাং প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সবসময় এই জায়গাতে থেকে যাচ্ছে। পরবর্তীতে মজুরি বোর্ডে মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হচ্ছে? যদি দারিদ্র্য সীমা হিসাব করা হয় তাহলে একটা সময় ছিল ক্যালরি ইনটেক অর্থাৎ প্রতিদিন কত ক্যালরি ব্যয় করার দরকার হয় সেটার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের দারিদ্র্য সীমাকে চিন্তা করা হত। সে জায়গা থেকে সরে এসে এখন আবার খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা প্রদ্ধতির খরচে চলে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং মজুরি হিসাবের জন্য মজুরি বোর্ড কোন প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করছে, শ্রমিকের প্রয়োজন নির্ধারণের জন্যে এই বিষয়গুলো সুস্পষ্ট না। সুতরাং এই বিষয়ে আরো বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা থাকা প্রয়োজন। আবার ক্যালরি ইনটেক

ম্যাথড এ গেলেও আসলে সেটা কি দারিদ্র সীমার ক্যালরি ইনটেক নাকি শ্রমিকের কাজ করার জন্যে যেটা বেশি প্রয়োজন সেই ক্যালরিকে বিবেচনায় নেওয়া হবে সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। ২১২২ কিলোক্যালরি, নাকি ২৪০০ ক্যালরি, নাকি ৩০০০ কিলোক্যালরি এই যে বিতর্কগুলো আছে এই বিতর্কগুলো নিয়েও সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। আবার পরিবারের সাইজ এর ক্ষেত্রেও একটা বড় ধরণের মাত্রা চলে এসেছে। সেটা হচ্ছে নির্ভরশীল সদস্য কতটুকু হিসাব করা হবে? প্রশ্নটা হল ৫ সদস্য, ৬ সদস্য, নাকি ২ সদস্যের পরিবার হিসাব করা হবে? একটা সময় ছিল যখন একাই একজন পরিবারের জন্য আয় করত। তখন তার একার আয়ে পরিবারে সহায়তা করা প্রয়োজন নাকি দুজন আর্নারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া প্রয়োজন এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। বহুল ব্যবহৃত কিছু আন্তর্জাতিক মান, আন্তর্জাতিক প্রদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে নির্ভরশীল সদস্যের হিসাব আছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিন্তা করলে সেই প্রদ্ধতিতে যাওয়া যায় কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। কারণ এখনও পর্যন্ত মজুরি হিসাবের যে প্রক্রিয়া তাতে গত পে কমিশনের সময় দেখেছি যে ৬ সদস্যের পরিবারের প্রয়োজন বিবেচনা করা হয়েছে। পরিবারের সংজ্ঞার জায়গাতেও কাজ করার সুযোগ আছে। সুতরাং জাতীয় বেতন স্কেলে ৬ সদস্যের পরিবার ধরে এবং জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনে যদি মজুরি নির্ধারনের ক্ষেত্রে নির্ভরতার অনুপাত বিবেচনা করা না হয় তাহলে গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে এটা বিবেচনা করা হবে কি হবেনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে বার বারই গার্মেন্টস মালিকদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে দুজন কাজ করে, তিনজন কাজ করে। সরকারি যে চাকরি সেখানে যদি স্বামী-স্ত্রী কাজ করে তাও দুজনই বেতন পায় সেখানে হিসাব করা হয় না। আমরা যেখানে কাজ করি সেখানে একজন পরিবারের যতজনই কাজ করুক না কেন তখন হিসাব করা হয় না যে কতজন নির্ভরশীল এবং কতজন স্বনির্ভর। প্রত্যেককেই তার পূর্ণ মজুরি দেওয়া হয় এবং তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করার হিসাবটা করে দেওয়া হয়। সুতরাং শ্রমিকের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আসবে কি না সে বিষয়ে অবস্থান সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।

আরেকটি বিষয় হল খাদ্য ভাতা মূল মজুরি কাঠামোর মধ্যে আসবে কিনা সেটা নিয়েও দ্বিমত আছে। খাদ্য ভাতাকে যদি আলাদা করা হয় তাহলে মূল মজুরির হিসাবটা কিভাবে করা হবে? খাদ্য ভাতাকে বাদ দিয়ে মূল মজুরি হিসেব করা হচ্ছে কিনা? খাদ্য ভাতা অবশ্যই মূল মজুরির মধ্যে আসবে এবং অবশ্যই মূল মজুরি বৃদ্ধি করবে। সেই জায়গাতে এই যে মাত্রাগুলো এবং এই খাদ্য ভাতাকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রবণতা রয়েছে। এই জায়গাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। মজুরি বোর্ডের নিরপেক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়াও যেমন আইনে দ্ব্যার্থক সেই সাথে নিরপেক্ষ প্রতিনিধির ভূমিকাও সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। আইনেও হয়নি বিধিতেও হয়নি। এই জায়গাতেও ফোকাস করা প্রয়োজন। নিরপেক্ষ প্রতিনিধি মজুরির একটা প্রস্তাব দিতে পারে। এবার নিরপেক্ষ প্রতিনিধির কোন প্রস্তাবের কথা শোনা যায় নি। অনেক সময় দুই পক্ষের যে প্রস্তাবনা থাকে সেখানে দ্বিমত হয় তাহলে নিম্নতম মজুরি বোর্ড সরেজমিনে তদন্ত করতে পারে, ফিল্ডে গিয়ে প্রয়োজন পরিমাপ করতে পারে। এবারের মজুরি বোর্ডের ক্ষেত্রে এরকম কোন উদ্যোগ ছিল বলে জানা নেই। এই প্রশ্নগুলো সামগ্রিক মজুরি নির্ধারণের যে প্রক্রিয়া তার মধ্যেই থেকে যায়। মজুরি ৮০০০ টাকা বা ৭০০০ টাকা যাই হোক না কেন মজুরি যদি ৫৩০০ টাকা থেকে ৬০০০ টাকাও বৃদ্ধি পায় তাহলে শ্রমিকের জন্যে কিছু হুমকির সৃষ্টি হয়। যেটা এর আগে দেখা গেছে। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিষয়গুলোকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত এবং এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করা উচিত। সুতরাং একজন শ্রমিককে যতটুকু মজুরি দেওয়া হয় তার বিনিময়ে শ্রমিকের উপর যে শোষণ করা হয় সেই বিষয়েও সচেতন থাকা উচিত। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিষয়টা এখানে চলে আসে। মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ি ভাড়া, শ্রমিক যে সমস্থ এলাকায় বসবাস করে সেই এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের যে দাম সেই দাম বৃদ্ধির বিষয়টাও নজরে আনা উচিত। এরকম অনেক অভিযোগ শ্রমিক করেন যে তাদের কাছ থেকে বেশি মূল্য রাখা হয়। সাধারণ একজন মানুষের কাছে একটা ঔষধের যে মূল্য রাখা হয় গার্মেন্টস শ্রমিকের কাছে তার থেকে এক/দুই টাকা বেশি রাখা হয়। এরকম অভিযোগ শ্রমিকরা মাঝে মাঝেই করে থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে এই বিষয়গুলো আলোচনায় নিয়ে আসা উচিত।

সামগ্রিক যে মজুরি সেই মজুরির ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জণ করা দরকার। সেই লক্ষ্যগুলোর সাথে এই মজুরির একটা সম্পর্ক আছে। টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে ২০৩০ সালের মধ্যে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে দারিদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই একটা মানসম্মত মজুরির ভুমিকা অপরিহার্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যে ১৭ টি লক্ষ্য তার মধ্যে ৯ টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মজুরির সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত। বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে যে সমস্ত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যেমন ভিশন ২০২১, সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সে জায়গাতেও কর্মক্ষম প্রজন্ম, দ্রুত দারিদ্র দূরিকরণের কথা বলা হয়েছে। টেকশই মানব উন্নয়ন অর্জন করতে চাইলে মজুরি ছাড়া এটা আসলে কতটুকু অর্জিত হবে এই প্রশ্ন থেকেই যায়। পার্সপেক্টিভ প্লান যেখানে আছে সেখানেও সকলের ক্ষেত্রে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং

মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন শ্রমিক তার সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। মানসম্মত খাদ্য এবং তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি পূরণ করতে পারে। মজুরি থেকে এই বিষয়টি অর্জন করা খুবই জরুরি।

গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি কেন গুরুত্বপূর্ণ? এটি টেকশই লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা উৎপাদনশীল কর্মীর কথা বলি, উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলি কিন্তু সেখানে যদি মানসম্মত মজুরি নির্ধারণ সম্ভব না হয় তাহলে সেই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শ্রম বাজারের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে ৬ কোটি ৮ লক্ষ শ্রমিক যারা কোন না কোন কর্মের সাথে জড়িত। দেখা যায় যে প্রতি ১৪ জনে ১ জন গার্মেন্টস এ কাজ করে। সুতরাং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে চাকরি সম্পর্কিত যে লক্ষ্যগুলো আছে এই ১৪ জনের একজনকে বাদ দিয়ে সেই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব নয়। এটাই মূল আলোচ্য বিষয়। এ জায়গাতেই সুচিন্তিত মতামত প্রয়োজন যে কি করা যেতে পারে? ট্রেড ইউনিয়নের বর্তমান প্রেক্ষিতে যে মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে সেটির ক্ষেত্রে আপিল এর সুযোগ আছে। বাংলাদেশের শ্রম আইনের বিধানে বলা আছে যে মজুরি বোর্ড যখন সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে তখন সরকার সেই প্রস্তাব পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যদি কোন পক্ষের আপত্তি দেওয়ার সুযোগ থাকে এবং সরকার যদি ন্যায়সঙ্গত মনে না করে তাহলে সরকারকে বোঝানো একটা চ্যালেঞ্জ। আর সেই চ্যালেঞ্জটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নিতে হবে যাতে করে সরকারের পক্ষ থেকে মজুরি বোর্ডে ফেরত পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করা যায় যে এটার পূণঃপরীক্ষা প্রয়োজন। একই সাথে আন্তর্জাতিক সংহতিও গুরুত্বপূর্ণ। মজুরি বৃদ্ধির সাথে শুধুমাত্র যে মালিক পক্ষের ভূমিকা বা শ্রমিক পক্ষের ভূমিকা আছে তা না এখানে একটা দরকষাকষির প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে যদি ট্রেড ইউনিয়নের প্রেক্ষিতে চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যায় যে বিশ্বব্যাপী গ্রাহক সচেতনতা এখন একটা বড় উপাদান। সে জায়গাতে ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করতে পারে।

খুব সম্প্রতি অক্সফাম এর গবেষণাতে অস্ট্রেলিয়ায় ১০০০ গ্রাহকের উপর জরিপ করে দেখা গেছে যে ৯০% গ্রাহক শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির জন্যে বেশি দামে পন্য কিনতে তারা রাজি। সুতরাং এই জায়গাগুলোতে বিশ্লেষন করা প্রয়োজন। মালিককে অবশ্যই শ্রমিকের প্রয়োজন অনুধাবন করতে হবে এবং তাদের মূল্য নির্ধারণের আলোচনার ক্ষমতার জায়গাতে ফোকাস করতে হবে। বিশেষ করে মজুরি বৃদ্ধির কারণে মালিক পক্ষ থেকে যে অভিযোগটা করা হয়, যে আশংকার কথা বলা হয় সেগুলো। কারখানা বন্ধ হলে তখন কি হবে?

বিজিএমইএ এর ওয়েবসাইট থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৪ সালে মজুরি ঘোষণা করার পর ১৯৯৫ সালে কোন কারখানা বন্ধ হয়নি। বরঞ্চ ১৭১ কারখানা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০০৬ সালে মজুরি ঘোষণা করা হলে পরবর্তীতে ২০০৭ সালে ২৫৩ টার বেশি কারখানা বৃদ্ধির বিষয়টি ঐ বিজিএমই এর ওয়েবসাইটের হিসাবেই আছে। ২০১০ সালে মজুরি ঘোষণা করা হল কিন্তু তখনকার তুলনায় ২০১১ সালে বিজিএমই এর ওয়েবসাইটেই ২৫০ টির বেশি কারখানার হিসাব আছে। ২০১৩ সালে মজুরি ঘোষণা করার পর ২০১৪ সালে বিজিএমই এর ওয়েবসাইটেই ৭৪ টি কারখানা বেশি দেখানো আছে। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধিজনিত কারনে কারখানা বন্ধ হওয়ার যে আশংকা সেটি কতটুকু মূলক নাকি অমলূক বিবেচনা করা উচিত। আসলে ব্রান্ডদের একটা প্রতিশ্রুতি থাকা প্রয়োজন যে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করলে তারা পন্যের মূল্য বৃদ্ধি করবে। ব্র্যান্ডসদের ক্ষেত্রে ক্রয়ের চর্চা একটা বড় ফ্যাক্টর। সেই দায়িত্বশীল ক্রয়ের চর্চা প্রয়োজন।

ব্র্যান্ডসরাও যে ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটা কম্বোডিয়া বা মায়ানমারের যে উদাহারণগুলো আছে সেখান থেকে শেখার সুযোগ আছে। এই ঘোষিত মজুরি পূণর্বিবেচনা করার ব্যাপারে সরকারের কাছে দাবি থাকবে। সরকারের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ যখন বাস্তবায়নে যাবে তখন এর লেভেল এ গিয়ে রিট্রেসমেন্ট এবং উৎপাদন টার্গেট বৃদ্ধির জায়গাগুলোতেও শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম এর ক্ষেত্রে আরও বেশি ফোকাস করা উচিত। একটা স্থায়ী প্রদ্ধতি করা যায়। আসলে প্রতিবারই দেখা যায় যে একেকটা দূর্ঘটনা ঘটে আর তার পরই মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়। তাই সরকারের দিক থেকে একটা স্থায়ী প্রদ্ধতি তৈরি করা প্রয়োজন যেটা শুধুমাত্র মজুরি ইস্যুতে কাজ করবে।

অনুলিখন
মোঃ মাসুম রহমান

সম্পাদনা
মামুন অর রশিদ

আইএলও'র প্রতিবেদন
সরকারি খাতে সবচেয়ে কম কর্মসংস্থান বাংলাদেশে

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে সরকারি খাতে সবচেয়ে কম কর্মসংস্থান বাংলাদেশে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশে মোট কর্মসংস্থানে সরকারি খাতের অবদান মাত্র ৩ দশমিক ২ শতাংশ।

International Labour Organization

'এশিয়া-প্যাসিফিক এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোস্যাল আউটলুক ২০১৮: অ্যাডভান্সিং ডিসেন্ট ওয়ার্ক ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক এ প্রতিবেদনটি ১৬ নভেম্বর প্রকাশ করেছে আইএলও। এতে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ৪৪ কোটি ৬০ লাখ শ্রমিক দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছেন। এছাড়া ৯৩ কোটি শ্রমিক আছেন, যারা ভালনারেবল বা ভঙ্গুর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

প্রতিবেদনে কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত বিভিন্ন তুলনামূলক বিশ্লেষণ উঠে এসেছে। লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটের গতি প্রকৃতিসহ বিশ্লেষিত বিষয়ের মধ্যে আছে মোট বেকারত্ব, যুব বেকারত্ব, শিক্ষার ধাপ অনুযায়ী বেকারত্ব, উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান, ভঙ্গুর কর্মসংস্থান, অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও কর্মঘণ্টা।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর কর্মসংস্থান ও আয়ের বিভিন্ন সূচক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ প্রতিবেদনে। এতে দেখা গেছে, বাংলাদেশে মোট কর্মসংস্থানে পাবলিক সেক্টর বা সরকারি খাতের অবদান ৩ দশমিক ২ শতাংশ।

নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সরকারি কর্মসংস্থানের হার বাংলাদেশেই সবচেয়ে কম। অন্য দেশগুলোর মধ্যে কম্বোডিয়ায় মোট কর্মসংস্থানে সরকারি খাতের অবদান ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। এ হার ইন্দোনেশিয়ায় ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। একই হারে কর্মসংস্থান হচ্ছে লাওসেও।

মোট কর্মসংস্থানে সরকারি খাতের অবদান মঙ্গোলিয়ায় ২২ দশমিক ৪ শতাংশ, মিয়ানমারে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ, পাকিস্তানে ১২ দশমিক ২ শতাংশ, ফিলিপাইনে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ, পূর্ব তিমুরে ২২ দশমিক ৬ শতাংশ ও ভিয়েতনামে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ।

নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বেতনভোগী কর্মীর হারও তুলনামূলক কম বাংলাদেশে। আইএলওর প্রতিবেদন বলছে, বেতনভোগী কর্মীর হার বাংলাদেশে ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ। এ ধরণের কর্মীর হার কম্বোডিয়ায় ৪৪ দশমিক ৪, ইন্দোনেশিয়ায় ৪৮ দশমিক ৮, মঙ্গোলিয়ায় ৫১ দশমিক ৬, মিয়ানমারে ৪০ দশমিক ৪, পাকিস্তানে ৩৮ দশমিক ৬, ফিলিপাইনে ৬২ দশমিক ২, পূর্ব তিমুরে ৪১ দশমিক ৬ ও ভিয়েতনামে ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ।

ভালনারেবল বা ভঙ্গুর কর্মসংস্থানের হার সবচেয়ে বেশি না হলেও তুলনামূলক বেশির দলেই আছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে মোট কর্মসংস্থানের ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশই ভঙ্গুর বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। এ ধরণের কর্মীর হার কম্বোডিয়ায় ৫৫ দশমিক ২, ইন্দোনেশিয়ায় ৪৮ দশমিক ৮, মঙ্গোলিয়ায় ৫১ দশমিক ৬, মিয়ানমারে ৪০ দশমিক ৪, পাকিস্তানে ৩৮ দশমিক ৬, ফিলিপাইনে ৬২ দশমিক ২, পূর্ব তিমুরে ৪১ দশমিক ৬ ও ভিয়েতনামে ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বেতনভোগী কর্মীদের মধ্যে লিখিত চুক্তি আছে এমন কর্মসংস্থানের হার বাংলাদেশে ৬৯ দশমিক ১ শতাংশ। নিম্ন-মধ্যম আয়ের অন্য দেশগুলোর মধ্যে এ সূচকে পাকিস্তানের কাছাকাছি অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানে বেতনভোগী কর্মীদের মধ্যে লিখিত চুক্তি আছে এমন কর্মসংস্থানের হার ৬৯ দশমিক ৫ শতাংশ। কম্বোডিয়ায় ৫৩ দশমিক ২ ও ভিয়েতনামে এ হার ৪১ দশমিক ২ শতাংশ।

বেতনভোগী কর্মীদের স্থায়ী চুক্তি আছে এমন কর্মসংস্থানের হার বাংলাদেশে ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ। কম্বোডিয়ায় বেতনভোগী কর্মসংস্থানের ৪৬ দশমিক ৮ শতাংশের স্থায়ী চুক্তি আছে। মিয়ানমারে ৪৫ দশমিক ৪, পাকিস্তানে ২৯ দশমিক ৬ ও ভিয়েতনামে এ হার ৩১ দশমিক ৮ শতাংশ।

শিশুশ্রম দূর করতে একযোগে কাজ করার তাগিদ

২০১৩ সালের জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩৪ লাখ ৫০ হাজার শিশু কোন না কোন শ্রমে নিয়োজিত। এর মধ্যে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে যুক্ত। এই বিশাল সংখ্যক শিশুশ্রমে নিয়োজিত থাকা শ্রমিকদের নিয়ে এসডিজি লক্ষ্যমাত্র আট দশমিক সাত অর্জন করা অর্থাৎ সকল প্রকার শিশুশ্রম মুক্ত করা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা।

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও ২০২৫ সালের মধ্যে সব রকমের শিশুশ্রম মুক্ত করার ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে একযোগে কাজ করে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে মনে করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক।

১২ নভেম্বর ২০১৮ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম দূরীকরণ: এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা আট দশমিক সাত অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক আলোচনা সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএফ), দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ড এবং গ্লোবাল মার্চ এগেইনেস্ট চাইল্ড রাইটস যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে।

কাজী রিয়াজুল হক বলেন, সরকার এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এখনো অনেক পিছিয়ে, যা অর্জন করা সম্ভব সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে। এসডিজির এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে দেশের ভাবমূর্তি জড়িয়ে আছে। তাই শিশুশ্রম নির্মূল করার প্রচেষ্টাকে কোনভাবেই খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। এর জন্য সকলকেই প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। একটি আলাদা শিশু অধিদপ্তর বা শিশু কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া এখন চলমান আছে।

কলকারখানা ও পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক সামছুজ্জামান ভূইয়া বলেন আমরা যতই শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করি না কেন যদি সকলে সচেতন না হয় তাহলে শিশুশ্রম পুরোপুরি নির্মূল সম্ভব নয়। পিতামাতাকে সচেতন করা যেন তারা তাদের শিশুদের কাজে পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাকিউন নাহার বেগম বলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যাতে ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে সম্প্রতি জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া শ্রম আইনের খসড়ায় কিছু ক্ষেত্রে শিশুশ্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুশ্রমকেও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারটা বিবেচনাধীন।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারম্যান ডঃ খাজা সামসুল হুদা বলেন, দরিদ্র এবং ছিন্নমূল শিশুরা যেন শিশুশ্রমে জড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য তাদেরকে কর্মমূখী শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করার উপর জোর দিতে হবে। বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকার যেন ভবিষ্যতে আর না বাড়ে সেই জন্য এখনই কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে আজকের শিশুরা ২০৩০-২০৪০ সালের মধ্যে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে দেশকে সেবা দিতে পারে।

সংস্থাটির পরিচালক আব্দুস সহিদ মাহমুদ বলেন, তত্ত্বাবধানের দিক দিয়ে আমাদের এখনো অনেক কাজ করতে হবে। রাজধানীর হিউম্যান হলারের শতকরা ৯০ ভাগ হেলপারই শিশু এবং বেশিরভাগের বয়সই ১২ বছরের নিচে। এই কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই কাজে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করা খুবই জরুরী।

টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ড এর কান্ট্রি ডিরেক্টের মাহমুদুল কবির বলেন, আমাদের সকলেরই শিশুশ্রমের ব্যাপারে চিন্তাধারা পাল্টাতে হবে। গৃহকর্মে শিশুদের ব্যবহার যে ঝুঁকিপূর্ণ সেটা বুঝতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে উন্নতি হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম না কমলে আমরা শিশুশ্রম নির্মূলে আমাদের প্রত্যাশিত ফলাফল পাবো না। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিশুশ্রম বিশেষজ্ঞ টি আই এম নুরুন্নবী খান।

সবার জন্য উন্মুক্ত মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার

অবশেষে মালয়েশিয়া শ্রম বাজারে লেগে থাকা জট খোলার আভাস পাওয়া গেছে। স্বল্প ব্যয়ে শিগগিরই কর্মী নিয়োগ শুরু করবে মালয়েশিয়ায়। কর্মী নিয়োগে নতুন কোন সিন্ডিকেট হবে না। সবার জন্য কর্মী নিয়োগের দুয়ার খুলে দেয়া হবে।

৩১ অক্টোবর বিকেলে রাজধানীর ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মালয়েশিয়ার ছয় সদস্য বিশিষ্ট জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে দ্বিতীয় দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক শেষে প্রবাসী সচিব রৌনক জাহান এ কথা বলেন।

এ সময় উভয় দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি-সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএমইটির মহাপরিচালক মো. সেলিম রেজা, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রীর পিএস মো. আবুল হাছানাত হুমায়ূন কবির ও কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের শ্রম সচিব মো. সাইদুল ইসলাম।

সভায় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন প্রবাসী সচিব রৌনক জাহান আর সফররত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মালয়েশিয়ার হিউম্যান রিসোর্স মন্ত্রণালয়ের পলিসি বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি এম ডি এম বেট্টী হাসান।

সচিব রৌনক জাহান বলেন, নতুন পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় দ্রুত জনশক্তি রপ্তানি শুরু হবে। মালয়েশিয়া সরকারের চাহিদা মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হবে। সফররত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশি কর্মীর মালয়েশিয়ায় প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশটির নিয়োগকর্তারাও দ্রুত বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিতে চাচ্ছে।'

এক প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী সচিব বলেন, 'কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাই কমিশনে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কর্মী নিয়োগের চাহিদাপত্রে সত্যায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে উভয় পক্ষই একমত হয়েছে।'

এর আগে সফররত প্রতিনিধি দল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসির সঙ্গে তার দফতরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মন্ত্রী সফররত প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ভ্রাতৃ-প্রতীম মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। সফররত প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ থেকে নতুন পদ্ধতিতে কর্মী নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এ ছাড়া জি টু জি প্লাসের আওতায় অপেক্ষমান মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু কর্মীদের সুষ্ঠুভাবে পাঠানোর জন্য সময় বাড়ানোরও আলোচনা চলছে বলেও জানানো হয়েছে।

এর আগে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি ১০ রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে গত সেপ্টেম্বর থেকে শুধুমাত্র বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য কলিং ভিসা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত রেখেছে মালয়েশিয়া সরকার। তবে পাইপলাইনে আটকে থাকা ৭০ হাজার কর্মী মালয়েশিয়া যাওয়ার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য মালয়েশিয়ার পূর্বতন সরকারের সময় মালয়েশিয়ায় কর্মী রপ্তানিতে ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সির সিন্ডিকেট চালু করা হয়। সিন্ডিকেট দুর্নীতি করে চাকরি প্রত্যাশীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেয় মর্মে সংবাদ প্রকাশ হয়। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি সরকার পর্যায়ে হওয়ার কথা থাকলেও মালয়েশিয়ার তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারি পর্যায়ে লোক নেওয়া পদ্ধতি বাতিল করলে তা বেসরকারি খাতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় বাংলাদেশ ৭ শতাধিক রিক্রুটিং এজেন্সির নাম দিলেও মালয়েশিয়া সরকার ১০টি কোম্পানিকে এ কাজে নির্বাচিত করে। এর ফলে সরকারি পর্যায়ে যেতে যেখানে ৪০ হাজার টাকার মতো খরচ হওয়ার কথা সেখানে সিন্ডিকেট তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার থেকে ৪ লাখ টাকা জন প্রতি হাতিয়ে নেয়।

তারপরও সমস্যা থাকে, যাদের মালয়েশিয়া পাঠানো হয় তাদের অনেকে কাজ পায় না। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলি লোক পাঠাতেই উৎসাহী, চাকরির ব্যাপারে নিশ্চয়তা পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। আবার অনেকে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া ঢুকে পড়ে এবং পরিণতিতে সেদেশে পুলিশি হয়রানির মুখে পড়ে।

মালয়েশিয়ায় চলতি বছরে ৪১ হাজার ১৮ জন অভিবাসী আটক করেছে সেদেশের ইমিগ্রেশন বিভাগ। দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা বারনামা সূত্রে জানা গেছে, আটকদের মধ্যে ১৩ হাজার ৬১৪ জন ইন্দোনেশিয়ার, ৮ হাজার ৭৪৮ বাংলাদেশি, ৪ হাজার ৬৮ মিয়ানমার, ৩ হাজার ৫৪৯ ফিলিপাইন, ২ হাজার ৭৯২ থাইল্যান্ড এবং ৮ হাজার ২৪৮ অন্যান্য দেশের নাগরিক।

জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছনীতি অনুসরণ ও চাকরি প্রার্থীদের জীবন-জীবিকার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা থাকলেও তা হয়না। ফলে জনশক্তি রপ্তানির একটি ভালো বাজারে জট লেগে যায়। অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে সিন্ডিকেট লাভবান হয়েছে, আর দেশের সাধারণ পরিবার যারা অনেক কষ্টে অর্থ যোগাড় করেছে তারা অসহায় হয়েছে।

বিল্‌স সংবাদ

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সহিংসতা প্রতিরোধে উচ্চতর প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষকদের সাথে গ্রুফ ফটোতে অংশগ্রহণকারী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ

কর্মক্ষেত্রে (গার্মেন্টস শিল্পে) জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে দুই দিনব্যাপী উচ্চতর প্রশিক্ষণ ৩-৪ নভেম্বর ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ সহ ট্রেড ইউনিয়নের করণীয় ও জেন্ডার পলিসি বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য।

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীরা যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, ঘোষণা ও মানদন্ডের আলোকে কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষন করা, হয়রানি প্রতিরোধে ট্রেড ইউনিয়নের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, সক্রিয় বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, মস্তিস্ক সঞ্চালন, বাজগ্রুপ, চরিত্রাভিনয়, গেমস্‌ প্রভৃতি প্রদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ করা হয়।

প্রশিক্ষণে ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশনের এডভোকেট সারা তানজিনা ইভা, বিল্‌স সম্পাদক রওশন জাহান সাথী, বাংলাদেশ শ্রমিক সংহতি ফেডারেশনের অর্থ সম্পাদক হাসিনা আক্তার, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয় কেন্দ্রের প্রতিনিধি ইদ্রিস আলী, বাংলাদেশ পোষাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের লতিফা আক্তার, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রি ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সংগঠক সালমা আক্তার. বিজিটিএলডব্লিইএফ এর মহিলা সম্পাদিকা শামীমা আক্তার, বিএফটিইউসি'র আফরোজা রহমান, মিসামি বিটপি গার্মেন্টস শ্রমিক ইন্ডাষ্ট্রি সভাপতি সুমা আক্তার, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের যুমা আক্তার, বিআইজিইউএফ এর সংগঠক জাকিয়া সুলতানা এবং শাহনাজ পারভীন, বিআরজিডব্লিউএফ এর সুমনা আক্তার, বিএলএফ এর আসমা আক্তার মুক্তি, এজিডব্লিউএফ এর এ এ গনি, বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোটের সামছুল হক, বিটিজিডব্লিউএল এর তাসলিমা খাতুন, এসজিএসএফ এর ডলি আক্তার, জিবিজিডব্লিউএফ এর সুমি আক্তার, বিএমএসএফ এর রহিমা আক্তার রূপা, এনজিডব্লিউএফ এর সুইটি সুলতানা, বিজেএসকেএফ এর লুৎফুন নাহার, জিটিডব্লিউএল এর ফরিদা ইয়াসমিন, বিজেএসডি'র লুৎফুন নাহার লতা, এসবিজিএসকেএফ এর মোঃ শাকিল আহমেদ, এফজিডব্লিউ এর ইফফাত আরা শেলী, এফডব্লিউএফ এর নাহিদা তানজুম কনা প্রমূখ অংশগ্রহণ করেন।

গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং অক্সফাম এর সহযোগিতায় গবেষণা ফলাফল উস্থাপন বিষয়ক সভা ১১ নভেম্বর বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স অক্সফাম এর সহযোগিতায় "বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকায়ন এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যান্ডস/ বায়ারদের সম্ভাব্য আর্থিক অংশগ্রহণ" শীর্ষক একটি গবেষণা বাস্তবায়ন করছে। উক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর মতামত এবং এ গবেষণায় আরো কোন কোন বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা যায় সেসব বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেন নেতৃবৃন্দ।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞার সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসানের সঞ্চালনায় সভায় গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর গবেষণা সমন্বয়কারী মনিরুল ইসলাম।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম অস্ট্রেলিয়ার ফেয়ার ইকোনমকিস এডভোকেসি ম্যানেজার জয় কিরিয়াকোও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ও জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুল আহসান, বিল্‌স যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, স্কপ সদস্য চৌধুরী আশিকুল আলম, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশে কাউন্সিলের মহাসচিব সালাউদ্দিস স্বপন, বিএডব্লিউএফ এর মোঃ তৌহিদুর রহমান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এর গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ মহাপরিদর্শক মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঞা, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শামীম আরা, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এ এম ফয়েজ হোসাইন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের এডভোকেট জাফরুল হাসান শরীফ, অক্সফাম প্রতিনিধি সৈয়দ নাঈম ইমরান এবং জোবায়দুর রহমান প্রমূখ।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

শ্রম ইস্যুতে নিয়মিত পাঠচক্র অনুষ্ঠিত

পাঠচক্র পরিচালনা করছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোস্তাফিজ আহমেদ

বিল্‌স লাইব্রেরীর উদ্যোগে শ্রম বিষয়ক নিয়মিত পাঠচক্র ৬ নভেম্বর ২০১৮ বিল্‌স লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠচক্রের বিষয় ছিল নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া। পাঠচক্র পরিচালনা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোস্তাফিজ আহমেদ। পাঠচক্রে কিভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়, মজুরি বোর্ডের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং বোর্ডের সদস্যদের ভূমিকা, অন্যান্য দেশে কিভাবে মুজরি নির্ধারণ করা হয়, নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে বিভিন্ন সমস্যা এবং এধরণের সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পাঠচক্রে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী নাজিয়াত ইসলাম, তাসনীম মশিউর, মোঃ ইবনে মিরান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোঃ জাহেদুর রহমান, সালমা আক্তার, প্রজ্ঞা রায়, মোঃ রাশেদুজ্জামান, আব্দুলাহ আল ফয়সাল, বিজেএসএফ এর মোঃ এনামুল হক প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

বিল্‌স এর চলমান গবেষণা কার্যক্রম

বিল্‌স এর গবেষণা বিভাগের অধীনে বিভিন্ন ইস্যুতে বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি এবং উন্নতির উপায় বিষয়ক পাঁচটি গবেষণা চলমান রয়েছে। গবেষণাগুলো হলো-

১. "তৈরি পোশাক শিল্পে সহিংসতা বিশ্লেষন" শীর্ষক গবেষণা।

২. "সেক্টরভিত্তিক প্রভাব মুল্যায়ণ (এসডব্লিইআইএ): বাংলাদেশের মৎস্য খাত"

৩. "গার্মেন্টস সেক্টরে জেন্ডার ভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক গবেষণা।

৪. "প্রাতিষ্ঠানিক খাতের তরুণ শ্রমিকদের অধিকার এবং শোভন কাজ" শীর্ষক গবেষণা।

৫. "গার্মেন্টস সেক্টরে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি: বিভিন্ন কতৃপক্ষের ভূমিকা এবং সুপারিশ প্রণয়ন: শীর্ষক গবেষণা।

রিক্সা-ভ্যানচালকদের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণী কর্মশালা

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

বিল্‌স এর উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর রিক্সা-ভ্যানচালকদের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণী কর্মশালা ১ নভেম্বর ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা মহানগরীর রিক্সা-ভ্যানচালকদের সংগঠিতকরন, অধিকার সচেতন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

স্কপ ও বিল্‌স অন্তর্ভুক্ত জাতীয় ফেডারেশনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এবং ঢাকা মহানগরীতে কর্মরত রিক্সা-ভ্যানচালক ইউনিয়ন/ফেডারেশন এর সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তাজরীন অগ্নিকান্ডের ৬ বছর স্মরণ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা সভা

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং মনডিয়াল এফএনভি'র সহযোগিতায় ২৪ নভেম্বর তাজরীন অগ্নিকান্ডের ৬ বছর স্মরণে ও ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ বিষয়ক আলোচনা সভা ১৫ নভেম্বর ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় স্কপভুক্ত জাতীয় ফেডারেশনের তৈরি পোষাক শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন ও ইন্ড্রাষ্ট্রিঅল এর অন্তর্ভুক্ত ফেডারেশন/ ইউনিয়নের সাভার-আশুলিয়া অঞ্চল কমিটির ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্‌স পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী নাজমা ইয়াসমীন এবং সূচনা বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ এর সাভার-আশুলিয়া আঞ্চলের সমন্বয়কারী, সাভার-আশুলিয়া আঞ্চলিক শাখা-জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আবদুল আউয়াল।

চট্টগ্রাম সংবাদ

চট্টগ্রামে বিল্‌স এর ৩য় বার্ষিক সম্মেলন
মালিক-শ্রমিক-সরকারের সমন্বিত কার্যক্রমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয় : মেয়র নাছির

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রামের সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এলআরএসসি ব্যবহারকারীগণের ৩য় বার্ষিক সম্মেলন ১৭ নভেম্বর ২০১৮ চট্টগ্রাম নগরীর হোটেল সেন্টমার্টিনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞার সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি-কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন। এছাড়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স এর যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান, উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহ্‌উদ্দিন আহম্মদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী কোহিনূর মাহমুদ, শ্রম ইস্যুতে গবেষক অধ্যাপক ড. ফসিউল আলম ও ড. শাহিন চৌধুরী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে তপন দত্ত, এ এম নাজিম উদ্দিন, মু. শফর আলী, মসিউদ্দৌলা প্রমুখ।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার বহুমাত্রিক উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সরকার শ্রম আইন সংস্কারসহ শিশুশ্রম নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ আনুষ্ঠানিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, তা বাস্তবায়নে শ্রমিক, মালিক উভয় পক্ষকে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

মেয়র বলেন, মালিক-শ্রমিক-সরকারের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিল্‌স কার্যক্রমে সব দলের অংশগ্রহণের ফলে সংগঠনটি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি বলেন, সফর আলী, নাজিম উদ্দীন ও তপন দত্ত এই তিনজনই তিনটি দলের নেতৃত্বে

রয়েছেন। বলা যায় তিনজনই বিপরীত রাজনীতিতে জড়িত। তারপরও এই বিল্‌স এর কার্যক্রমে এক অভিন্ন দাবি আদায়ের আপসহীন নেতা তারা। এই গুণী রাজনীতিবিদদের কাছে থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। তারা যদি এক জায়গায় শ্রমজীবী মানুষের রুজি রোজগারের উন্নয়নে কাজ করতে পারেন, জাতির উন্নয়নে কেন আমরা এক জায়গায় এসে কাজ করতে পারব না?

মেয়র বলেন, দেশের উন্নয়নে আমাদের সবার দায়বদ্ধতা আছে। নিজ নিজ অবস্থান থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে দেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

সম্মেলনে শ্রমিক নেতারা বলেন, দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে শ্রমিক মৃত্যু ও দুর্ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের পরিদর্শন বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা, মালিক-কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, অব্যবস্থাপনা ও যথাযথ তদারকির অভাবে প্রতিনিত ঝুকিঁপূর্ণ কর্মপরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হওয়ার ফলে অসহায় শ্রমিকেরা একের পর এক দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর শিকার হচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা রোধ, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রম আইন কার্যকর করা এখন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগী ভূমিকা প্রয়োজন বলে নেতারা উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিষয়ভিত্তিক ৫টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা গৃহিত হয়।

বিল্‌স এর আসন্ন কার্যক্রম

- শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের উদ্যোগে ২৪ নভেম্বর ২০১৮ তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকান্ডের ছয় বছর স্মরণে জুরাইন কবরস্থানে নিহত শ্রমিকদের কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করা হবে।
- বিল্‌স এর উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর ২০১৮ ঢাকা মহানগরীরর রিক্সা-ভ্যানচালকদের জীবনযাত্রা, অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও দাবীনামা অনুমোদন সম্মেলন ২৫ নভেম্বর ২০১৮ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে।
- পাট শিল্প শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং সম্ভাবনা শীর্ষক সম্মেলন ২৫ নভেম্বর ২০১৮ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে।
- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের জন্য নীতি ও বিধিমালা প্রণয়ণের লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দদের নিয়ে আলোচনা সভা নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।
- বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং অক্সফামের সহযোগিতায় ১২ টি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাথে পরিকল্পনা সভা নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।
- ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে বার্ষিক নীতি পর্যালোচনা সভা নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।
- বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং মনডিয়াল এফএনভি'র উদ্যোগে পাঁচ দিন ব্যাপী উচ্চতর প্রশিক্ষণ ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।
- বিল্‌স এর প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটির সভা ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।
- বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং মনডিয়াল এফএনভি'র সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হবে ১০ ডিসেম্বর ২০১৮। চারটি এলাকায় মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে র‍্যালি এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হবে।
- গৃহশ্রমিকদের সংগঠিত করণের লক্ষ্যে এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা সভা ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।
- ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক অভিবাসী মেলায় মেলায় অংশগ্রহণ করবে বিল্‌স।

তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকান্ডের ছয় বছর:

আহত শ্রমিকদের অবস্থা

চৌধুরী বোরহান উদ্দিন

২৪ নভেম্বর ২০১৮। আশুলিয়ার তাজরীন ফ্যাশন গার্মেন্টসে আগুন লাগার ছয় বছর। দেশের পোশাকশিল্পের জন্য একটি কালো দিন। ২০১২ সালের এই দিনে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের নিশ্চিন্তপুর এলাকার তাজরীন পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ১১২ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। আহত হয় আরো তিন শতাধিক শ্রমিক। দেশের ইতিহাসে একসঙ্গে এত শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম।

অগ্নিকান্ডের এত দিন পরও শেষ হয়নি নিহত শ্রমিকদের স্বজনদের আহাজারি। নিহতদের পরিবার এখনো ভোগ করছে স্বজন হারানোর বেদনা। অন্যদিকে পঙ্গু সদস্যদের নিয়ে নিদারুণ কষ্টে আছে তাদের পরিবার। পূরণ হয়নি আহত শ্রমিকদের পরিপূর্ণ চিকিৎসা সেবার আকুতিও। দেশী-বিদেশী অল্পকিছু প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় এদের মাঝে সাময়িক স্বস্তি ফিরলেও অনিশ্চয়তা কাটেনি শারীরিকভাবে অক্ষম ও অর্ধাহারে-অনাহারে থাকা শ্রমিকদের। নানা প্রতিকূলতা আর অবহেলায় জীবন কাঁটছে তাদের।

অক্ষমতা ও চরম অসহায়ত্বের মধ্যে নিপতিত আজ শত শত শ্রমের হাত। তাজরীন ফ্যাশনসের ছয় বছর অতিক্রান্ত হলেও

সকল ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পৌছানো সম্ভব হয়নি, হয়নি নিখোঁজদের খুঁজে বের করার কাজ। আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এখনো হয়নি নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের সন্তানদের জীবন-জীবিকার ও ভবিষ্যত নিশ্চয়তা ।

''তাজরীন ফ্যাশন'': তাজরীন ফ্যাশন লিঃ তুবা গ্রুপের ১৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানটির মালিক দেলোয়ার হোসেন। বিল্ডিংটি ছিল নয় তলা এবং উক্ত ভবনে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। ভবনের নীচ তলা ছিল গুদাম ঘর, গুদামে পেট্রোলিয়াম বায়ো প্রোডাক্ট বা সিনথেটিক ও এ্যাক্রিলিক জাতীয় সুতা ও কাপড়ে পরিপূর্ণ ছিল। কারখানায় জরুরী বহির্গমন পথ ছিল মাত্র তিনটি এবং তিনটি সিঁড়ি ছাদ থেকে নেমে আসলেও দুইটি সিঁড়ি নিচে গুদাম ঘরে গিয়ে মিলেছে, অন্যটি ছিল একটু দূরে।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর সন্ধায় ৭টার দিকে আশুলিয়ায় নিশ্চিন্তপুরে ৯ (নয়) তলা তাজরীন ফ্যাশনে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের দিন চারশরও বেশী শ্রমিক সেখানে কর্মরত ছিল। তাৎক্ষনিকভাবে বিজিএমইএ থেকে নিহত ও আহত শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে সর্বশেষ ২০১৫ সালের অক্টোবরে ''তাজরীন ফ্যাশন ক্লেইমর্স এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন'' গঠন করা হয় এবং প্রত্যেক নিহত, নিখোঁজ এবং আহত শ্রমিকদের যাচাই-বাছাই করে অ্যাসেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটি জাতীয় মানদন্ড ঠিক করে ডার্চ বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

আহত শ্রমিকদের বর্তমান শারিরীক অবস্থা : তাজরীন ফ্যাশন গার্মেন্টেস এ অগ্নিকান্ডের প্রায় ছয় বছর অতিবাহিত হলেও এখনো অনেক আহত শ্রমিক এক মানবেতর জীবন-যাপন করছে। অনেকে এখনো অসুস্থ। অনেকে কোন কাজ-কর্ম করতে পারেনা। তাজরীন ফ্যাশন এর শ্রমিক রেহেনা বেগম। তাজরীন অগ্নিকান্ডের দিন চার তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে মাঝা ও হাত ভেঙ্গে যায়। বুকেও পান প্রচন্ড আঘাত। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত নিয়মিত চিকিৎসা নিতে হচ্ছে তাকে। কিছুদিন ভালো থাকেন তো আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। অভাবের তাড়নায় সবসময় চিকিৎসাও নিতে পারেননা, ঠিক মতো ঔষধ কিনতে পারেননা। পরিবার এবং নিজের চিকিৎসা খরচ চালাতে গিয়ে বাচ্চাদের মুখে খাবার দিতে পারেন না নিয়মিত। এভাবেই চলছে তার ৬ (ছয়) বছর।

তাজরীন ফ্যাশনের রেহানা বেগমের মতো সুপারভাইজার সোলায়মান, অপারেটর ফাতেমা বেগম, আঞ্জুয়ারা বেগম, সিনিয়র অপারেটর জরিনা বেগম তাদেরও একই অবস্থা বিদ্যমান।

আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: তাজরীন ফ্যাশনের হতাহত শ্রমিকদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত করুন। শারীরিকভাবে এখনও যারা অসুস্থ তারা এখনও কোথাও স্থাযীভাবে কোন কাজে যোগ দিতে পারছেনা। আলেয়া বেগম তাজরীনে গার্মেন্টর্সএ ৪র্থ তলায় ছিলেন, সেখান থেকে লাফ দিয়ে নীচে টিনসেড ঘরের উপর পড়ে মাজার হাড়,গলার হাড় ভেঙ্গে যায়, বুকে ও চোখে প্রচন্ড আঘাত পান। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নারী শিশু কেন্দ্রে চিকিৎসা দেয়, পরবর্তীতে মেডিকম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়, কয়েকদিন পর অবস্থা খারাপের দিকে গেলে ঢাকা ট্রমা সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়। বিজিএমইএ তার চিকিৎসা ব্যায়ভার বহন করে।

দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে বিজিএমইএ থেকে ১লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পান। সেই টাকা পরবর্তী চিকিৎসা ও সংসার খরচ বাবদ খরচ হয়ে যায়। বর্তমানে সে কোন কাজ করতে পারেনা, কোথাও কোনো কাজের জন্য গেলেও বলে যে আপনি কাজ করতে পারবেন না। অসুস্থ স্বামী, দুইটি সন্তান দিয়ে এক মানবেতর জীবন-যাপন করছেন আলেয়া বেগম।

আহত শ্রমিকদের বর্তমান স্বাস্থ্যগত অবস্থা: দুর্ঘটনার সময়ে তাজরীন ফ্যাশন শ্রমিকদের যে সকল শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল দূর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে শারীরিক সমস্যাগুলো আরো ব্যাপক আকারে প্রসারিত হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি আরো বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা আস্তে আস্তে কর্মক্ষম হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। যদি উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা না যায় তাহলে ধীরে ধীরে আরো অনেক প্রাণ অকালে ঝড়ে পড়বে।

২০১১ সালে তাজরীন গার্মেন্টর্সএ ৪র্থ তলায় অপারেটর পদে চাকুরী নেন মুক্তাবানু। মোটামুটি ভালোই দিন যাচ্ছিল তার। তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকান্ডের সময় জীবন বাচাঁতে জানালার কাঁচ

ভেঙ্গে চার তলা থেকে নিচে লাফ দেন। প্রাণে বেচেঁ গেলেও সেদিন তার মাথা ফেটে যায়, এছাড়া বুকে, পিঠে ও কানে প্রচন্ড আঘাত পান। এর পর থেকে কারিতাস, বিল্‌স সাপোর্ট সেন্টারে চিকিৎসা নিয়েছেন, কানের চিকিৎসার জন্য এখনো পিজি হাসপাতাল, নিউরোসাইন্স হাসপাতাল ও গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। সর্বশেষ চিকিৎসাপত্র অনুযায়ী ডাক্তার জানান যে চিকিৎসা এখানে হবেনা, তাকে ভারতে যেতে হবে। যে টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন তা চকিৎসা বাবদ খরচ হয়ে আরো অনেক টাকা ধার-দেনা করতে হয়েছে তাকে। বর্তমানে তার স্বামী রাজমিস্ত্রির জোগারীর কাজ করে পরিবার চালান, শারীরিক অসুস্থতার জন্য মুক্তাবানু কোন কাজ করতে পারেন না।

আহত শ্রমিকদের মানসিক অবস্থা: তাজরীন ফ্যাশন শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই এখনও মানসিকভাবে অসুস্থ। কিছু-কিছু শ্রমিক তাদের জীবনের প্রয়োজনে কোন না কোন কর্মে যোগদান করলেও বেশিরভাগ শ্রমিক তা করতে পারেনি। তারা এখনও আতঙ্কগ্রস্ত। তাজরীন ফ্যাশনের আহত শ্রমিক গোপালগঞ্জের রূপা, ময়মনসিংহের আরফুজা, নঁওগার সিরাজুল ইসলাম এখনও সেই দু:সহ স্মৃতি ভুলতে পারেনি, ঘুমের মধ্যে তারা দেখতে পায় দাঁউ দাঁউ আগুনের লেলিহান শিখা, জোরে কোন শব্দ শুনলে তারা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে দোঁড় দেয়, সামান্য জোরে চিৎকার শুনলেও তারা ভয় পায়।

আর্থিক সহায়তা পাননি এমন শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা: ফেন্সী বেগম ২০১১ সালে তাজরিন ফ্যাশন লি: অপরেটর পদে চাকুরি নেন। অগ্নিকান্ডের সময় তৃতীর তলা থেকে জানালা দিয়ে লাফ দেন। তখন তিনি দুই মাসের অন্তঃসত্তা ছিলেন। লাফ দেওয়াতে তার মাঝার একটি হাঁড় ভেঙ্গে যায়, এছাড়া মাথায় ও বুকে আঘাত পান। তবে তার সন্তানের কোন ক্ষতি হয়নি। হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে অনেককে ব্যাংক হিসাব খুলে দেয়া হলেও তাকে ব্যাংক হিসাব খুলে দেওয়া হয়নি।

তাজরীন ফ্যাশনস নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের সন্তানদের বর্তমান পরিস্থিতি: শামীমা আক্তারের বাবা এবং মা দুজনই তাজরীন অগ্নিকান্ডে নিখোঁজ হয়েছেন। তাদের পরিবার এখনো তাদের মা-বাবার লাশের সন্ধান পাননি। তারা দুই ভাই বোন। বর্তমানে শামীমা আক্তার ৯ম শ্রেণীতে পড়ে, আর ভাই ৬ষ্ট শ্রেণীতে পড়ে। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে শামীমার নানী হাবিবা বলেন আমার মেয়ের ঘরে এক ছেলে এক মেয়ে। নাতি-নাতনি দুইটা আমার কাছে থাকে মাঝে মধ্যে তারা দাদার বাড়ী যায়। ছেলে-মেয়ে দুইটা এখনও পর্যন্ত মা-বাবার জন্য কান্নাকাটি করে। আমি তাদেরকে কী বলবো ঠিক মেলাতে পারিনা, কী করে আমার কপালে এ দূর্গতি আসলো। এক পর্যায়ে তিনি বলেন লাশটা যদি পাইতাম তাহলে মনকে বুঝ দিতে পারতাম। ওদের পড়ালেখার খরচ ও সংসার কিভাবে চলে জানতে চাইলে তিনি জানান ওদের নানারও বয়স হয়ে গেছে তেমন কাজ-কর্ম করতে পারেনা। কিছু বন্ধকী জমি আছে তা থেকে বছরে কিছু ফসল পাওয়া যায় তাই দিয়ে কোনো রকমে চলে। হাবিবা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন 'আজ আমি নি:সন্তান আমার নাতি-নাতিনরাও এতিম'। হাবিবা বেগম আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, আমার টাকা পয়সার দরকার নেই, আমার মেয়ে চাই, আমার সন্তান চাই।

করণীয়: সরকারকে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সমস্যাসমূহ প্রায় চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রয়োজন সমস্যা সমূহের সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়া। সরকার ও বিজেএমইএ যৌথ পরিকল্পনায় অনেক গুলি সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। এ জন্য সরকারি সহযোগিতার হাত আরও বেশি বাড়াতে হবে।

আমরা আর কোন শ্রমিকের আর্তনাদ শুনতে চাই না। আমরা চাই শ্রমিকের নিরাপদ কর্মস্থল।

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৯ শতাংশ

চলতি অর্থবছরের (২০১৮-১৯) প্রথম চার মাসে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ১৯ শতাংশ। এই সময়ে আয় হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৩৬৫ কোটি ডলার। সর্বশেষ অক্টোবর মাসে রপ্তানি আয় প্রায় ৩১ শতাংশ বেড়েছে।

৬ নভেম্বর ২০১৮ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী আয় হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৩৬৫ কোটি ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২ দশমিক ৫৭ ও আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের ৩ হাজার ৬৬৭ কোটি ডলার রপ্তানি আয় হয়েছিল। প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক ৮১ শতাংশ।

এ সময়ে পোশাক খাতে মোট আয় হয়েছে ১ হাজার ১৩৩ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ে তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে ওভেন পোশাক বা প্যান্ট-শার্ট রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৫৪৬ কোটি ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি। আর নিট বা গেঞ্জি জাতীয় পোশাক রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৫৮৮ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৮ শতাংশ বেশি।

আলোচ্য সময়ে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৩৬ কোটি ৬৫ লাখ ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি। তবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে রপ্তানি আয় ১৯ শতাংশ কমেছে। এ খাতে আয় দাঁড়িয়েছে ৩৪ কোটি ৫২ লাখ ডলার। একইভাবে পাট ও পাটপণ্য রপ্তানি আয়ও কমেছে। এ খাতে আয় হয়েছে ২৮ কোটি ৮৮ লাখ ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ কম।

পেশা পরিচিতি: পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক

পুরনো বাড়ি। আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘর। তার স্যাঁতসেতে মেঝেতে বিভিন্ন বয়সের লোক পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজ করছে। এরা পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক নামে পরিচিত। আর বই শব্দটি আসলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরান ঢাকার কাগজীটোলা, শ্যামবাজার কিংবা ফরাসগঞ্জের রাস্তা। রাস্তার ধারের অধিকাংশ বাড়িই পুরনো। আর বেশিরভাগ বাড়ির নিচতলা জুড়ে চলে কর্মযজ্ঞ- বই বাঁধাইয়ের কাজ। জানুয়ারির বই উৎসব ফেব্রুয়ারিতে বই মেলা কিংবা সারা বছর ধরে ছাপা বিভিন্ন প্রকাশনীর বিভিন্ন প্রকারের বই বাঁধাইয়ের কাজ হয় পুরানো ঢাকার একটা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। আমরা সুন্দর বাঁধাই বই হাতে পাই, কিন্তু জানিনা এই বই বাঁধাই করল কে? জানিনা তার জীবনের বাঁধুনিটাই বা কেমন।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিদ্যুতের আলোতে চলে বই বাঁধাইয়ের কাজ। পাঠ্যবই থেকে শুরু করে কবিতা-গল্প-উপন্যাস কিংবা ধর্মগ্রন্থ সবই বাঁধেন তারা। শিশু থেকে শুরু করে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের মানুষরাও এ পেশায় জড়িত। এদের কাজের ধরণও আলাদা। কেউ ছাপানো বড় কাগজ ভাঁজ করেন, কেউবা ভাঁজ করা কাগজ সাজিয়ে রাখেন। কেউ সুঁইয়ে সুতা লাগিয়ে ফর্মাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে দেন, যাতে ফর্মার কোনো ওলট-পালট না হয়। এইভাবে মলাট লাগানো, তারপর মেশিনে বইয়ের তিনধার কেটে ফিনিশিং দেওয়া ও প্যাকেজিং করার পর সেই বই আমরা বাজারে পাই। পাঠকের বইটি পড়ার সময় যাতে বিষয়ের ধারাবাহিকতার কোন ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য শ্রমিকদের খুবই সতর্ক থাকতে হয় পুরো সময়টাতে। ছাপাখানা থেকে নিয়ে আসার পর থেকে শুরু করে বই বাঁধাই করা পর্যন্ত রাখতে হয় অখন্ড মনোযোগ।

পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজে শ্রমিকরা আসে মূলত টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, সিরাজগঞ্জের চৌহালী ও মানিকগঞ্জের দৌলতপুর অঞ্চল থেকে। অভাবের তাড়নায়, জীবন ধারণের তাগিদে তারা ঢাকায় আসে। শুরু করে বাঁধাইয়ের কাজ।

এদের কাজের বিভিন্ন ধরণ আছে। কেউ করে রোজ অনুযায়ী আবার কেউ দিন চুক্তি হিসেবে। সকাল ৮ থেকে শুরু হয় কাজ।

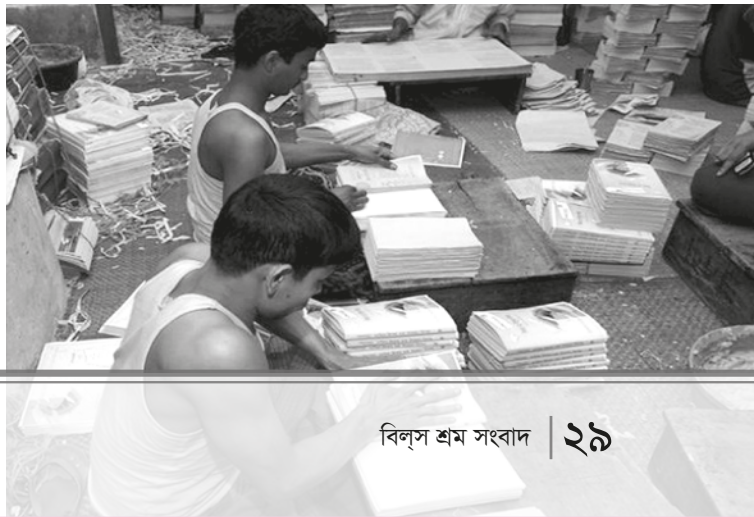

সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১ম রোজ এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০ পর্যন্ত ২য় রোজ আর রাত ১০টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত হাফ রোজ। যদি একজন শ্রমিক সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করে তাহলে তার মোট আড়াই রোজ কাজ হয়। তবে বেশির ভাগ শ্রমিকরা ২ রোজ পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য হয়। দুই রোজ মানে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা।

এছাড়া আছে প্রোডাকশন ভিত্তিক মজুরি, যার রেট প্রতি হাজার ফর্মা কাগজ ভাঁজ করা, সেলাই করা, পেস্টিং করা, ম্যাচিং করার ভিত্তিতে নির্ধারিত। বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সর্বশেষ ২০১৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৬ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ২৭ টাকা, ৮ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ১৭ টাকা দেওয়া হয়।

এই বাজারে ২ রোজ কাজ করা ছাড়া সংসার চলে না। একজন দক্ষ মজুরের প্রতি রোজ মজুরি ১৭৫ টাকা। ২ রোজ অর্থাৎ ১২ ঘন্টা কাজ করলে প্রতিদিন সর্বসাকুল্যে ৩৫০ টাকা মজুরি পেতে পারে একজন শ্রমিক। এর মধ্যে সারাদিনের খাবার বাবদ তাকে খরচ করতে হয় একেবারে কম করে হলেও ১০০ টাকা। তাহলে সারা মাস কাজ করলে খাবার খরচ বাদ দিয়ে তার হাতে থাকে মাত্র ৬০০০-৬৫০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে নিজের ঔষধপত্র ও হাত খরচ বাদ দিলে পরিবারের জন্য গ্রামে পাঠাতে পারে খুবই সামান্য টাকা। একজন দক্ষ শ্রমিকের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে অদক্ষ ও শিশু শ্রমিকদের কী অবস্থা তা অনুমান করা যায়। এই কারাখানাগুলোতে ১০/১২ বছরের শিশুরা খাবার ও মাসে ২০০০/৩০০০ টাকার বিনিময়ে দিন রাত কাজ করে, যে সময়ে তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা! একমাত্র ঈদ উৎসব ছাড়া অন্য কোন ছুটি তাদের নেই। সকল ধরণের উৎসব বোনাস থেকে তারা বঞ্চিত। উৎসবের সময় শুধুমাত্র মাসের মজুরি নিয়ে শুষ্ক মুখে শ্রমিকরা বাড়ি ফেরে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন কিংবা শুক্রবার তাদের কাজ কখনও বন্ধ হয় না।

বাঁধাই শ্রমিকরা কাজের জায়গাতেই খায়। কাজ শেষে জায়গা পরিষ্কার করে তারা লাইন দিয়ে ঘুমাতে যায়। কাজের মৌসুমে কারখানায় যখন প্রচুর কাগজ থাকে তখন তারা এর উপরেই ঘুমায়। আলো-বাতাসহীন অপরিষ্কার ঘর, স্যাঁতসেতে মেঝে আর কাগজের ধুলো-ময়লা, এর উপরই হাড়ভাঙা খাটুনির পর প্রায় নেতিয়ে পড়া শরীর নিয়ে শুয়ে পড়া।

অত্যাবশ্যকীয়ভাবে লেগে থাকে হাঁপানি, চর্মরোগসহ নানা ধরণের রোগের প্রকোপ। কেউ অসুস্থ হলে বিশ্রামের জন্য কোন জায়গা নেই। অসুস্থ হয়ে বইয়ের বান্ডিলের উপর বিশ্রাম নিতে গেলেও মালিক বা ম্যানেজারের গালিগালাজ শুনতে হয়। কারখানায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই। লাইনের পানি পান করতে শ্রমিকরা বাধ্য। এই সেক্টরের শ্রমিকদের কাজের সময় দুর্ঘটনায় শারীরিক কোন ক্ষতি বা মৃত্যু হলে মালিকপক্ষ বা রাষ্ট্র তার দায়-দায়িত্ব বহন করে না।

সংগঠন পরিচিতি:
ডিজিবি বিল্ডার্সউইর্ক বান্ড

DGB BILDUNGSWERK BUND

ডিজিবি বিল্ডার্সউইর্ক বান্ড জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্থা যারা রাজনৈতিক এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহে জ্ঞান বিস্তারে কাজ করে।

১৯৭২ সালে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ চার দশক ধরে এটি পেশাগত স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, ব্যবসা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার দক্ষতা প্রদর্শন করেছে।

ডিজিবি বিল্ডার্সউইর্ক বান্ড এর ওয়ার্ক কাউন্সিল কোয়ালিফিকেশন ডিভিশন ৪৫ বছর ধরে ওয়ার্ক কাউন্সিল এবং অ্যাডভোকেসি গ্রুপকে ট্রেনিং দিয়ে আসছে।

ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম। এটি প্রথমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে পরে একসাথে সমস্যাগুলোর সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পক্ষ সমূহের সাথে আলোচনা করে। ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে আপনার অবদান আপনি ডিজিবি'র মাধ্যমে রাজনৈতিক আলোচনায় তুলে ধরতে পারেন। আপনার সংগঠনের জন্য কি গুরুত্বপূর্ণ সেটার রাজনৈতিক উপায়ও খুঁজে দেখতে হবে।

ডিজিবি'র অভিজ্ঞ শিক্ষা উপদেষ্টাগণ, শিক্ষক এবং সেমিনার স্টাফরা বহু বছর ধরে মানুষের পাশে আছে। প্রতি বছর ডিজিবি'র পক্ষ হতে সমগ্র জার্মান জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প কারখানাগুলোতে ৫০০টিরও বেশি ইভেন্ট অফার করা হয়।

জার্মানিতে ডিজিবি একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা ওর্য়াক কাউন্সিলদের জন্য দুই সপ্তাহের বেসিক ট্রেনিং দিয়ে থাকে। এছাড়া দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছোট ছোট সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। সব ইভেন্ট ইউনিয়ন সদস্য ও অ-ইউনিয়ন সদস্যদের জন্য উম্মুক্ত।

ডিজিবি'র সাথে যুক্ত হয়ে আপনি একটি অপরিহার্য নেটওর্য়াকের অংশ হয়ে থাকতে পারবেন। যেখানে পারস্পারিক যোগাযোগ ছাড়াও আপনার কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি ক্ষেত্র তৈরি হবে।

ট্যানারি শিল্পনগরী ও দুই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভার ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি (ট্যানারি শিল্প নগরী) উদ্বোধন করেছেন। এ সময় তিনি দূষণ রোধে শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ট্যানারি মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ৬ নভেম্বর ২০১৮ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ট্যানারি শিল্প নগরী উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময়ই দূষণের বিষয়টি মনে রাখতে হবে। এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী এসময় মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় 'এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' এবং সিরাজগঞ্জে 'বিএসসিআইসি শিল্প পার্ক' উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম প্রমুখ। ভিডিও কনফারেন্স পরিচালনা করেন- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান।

উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিরাজগঞ্জে অবস্থানরত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মো. নাসিমের সাথে মতবিনিময় করেন এবং মুন্সিগঞ্জ ও সাভারের স্থানীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী, বীরমুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তার সরকার গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে সকল ট্যানারি শিল্প মালিক সুপারিশকৃত প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে এপিআই শিল্প পার্ক উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী দেশে ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে আমাদেরকে মনোযোগী হতে হবে। আমরা ওষুধ রপ্তানি করি, কিন্তু ওষুধের বেশির ভাগ কাঁচা মালের জন্য আমাদেরকে বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। শিল্প পার্কে ওষুধ শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের বিপুল পরিমাণ চাহিদা রয়েছে বিদেশের বাজারে। বাংলাদেশ বিশ্বের একশ'র বেশি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে।

শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ আমরা প্রতি সংখ্যায়ই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি পাঠকদের সুবিধার্থে। এ সংখ্যায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারাসমূহ তুলে ধরা হলো:

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ নিরাপত্তা (গত সংখ্যার পর)

৭১। প্রেসার প্যান্ট।-- যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন প্যান্ট বা যন্ত্রপাতির কোন অংশ স্বাভাবিক বায়ু চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে পরিচালিত হয়, সে ক্ষেত্রে যেন উহা উহার নিরাপদ চাপ অতিক্রম না করে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৭২। মেঝে, সিঁড়ি এবং যাতায়াত পথ।-- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে–

(ক) সকল মেঝে, সিঁড়ি, চলাচল পথ মজবুতভাবে নির্মাণ করিতে এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে উহাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মজবুত রেলিং এর ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(খ) যে স্থানে কোন সময়ে কোন ব্যক্তিকে কাজ করিতে হয়, সে স্থানে যাতায়াতের জন্য, যুক্তি সংগতভাবে যতদূর সম্ভব নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং

(গ) কর্মস্থলের সকল ফ্লোর, চলাচলের পথ ও সিঁড়ি পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত ও বাধা বন্ধকহীন হইতে হইবে।

৭৩ পিট, সাম্প, সুড়ঙ্গ মুখ ইত্যাদি।-- যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন স্থির আঁধার, কূপ, গর্ত অথবা সুড়ঙ্গ পথ এমন হয় যে, উহার গভীরতা, অবস্থান, নির্মাণ, অথবা অভ্যন্তরীস্থ বস্তুর কারণে ইহা বিপদের কারণ হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে উহাকে মজবুতভাবে নিরাপদ ঘেরা অথবা ঢাকনা দিয়া রাখিতে হইবে।

৭৪ অতিরিক্ত ওজন।-- কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রমিককে, তাহার ক্ষতি হইতে পারে এমন কোন ভারী জিনিস উত্তোলন, বহন অথবা নাড়াচাড়া করিতে দেওয়া যাইবে না।

৭৫ চোখের নিরাপত্তা।-- উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়– এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকার বিধি দ্বারা এই নির্দেশ দিতে পারিবে যে, উক্তরূপ কোন প্রক্রিয়ায় যদি নিম্নবর্ণিত কোন আশংকা থাকে, তাহা হইলে উক্ত প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিকের চোখের নিরাপত্তা বিধানের জন্য উপযুক্ত চশমা বা চোখাবরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যথাঃ–

(ক) প্রক্রিয়ার কারণে উৎক্ষিপ্ত বা বিচ্ছুরিত কণা বা টুকরা হইতে চোখের বিপদের আশংকা;

(খ) অতিমাত্রায় আলো বা উত্তাপের কারণে চোখের ক্ষতির আশংকা।

৭৬ ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ নির্ণয় অথবা উহার স্থায়িত্ব পরীক্ষার ক্ষমতা।-- যদি কোন পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা উহার অংশ বিশেষ, অথবা উহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি অথবা প্যান্ট এমন অবস্থায় আছে যে, উহা মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য হুমকীস্বরূপ তাহা হইলে তিনি প্রতিষ্ঠানের মালিকের উপর লিখিত আদেশ জারী করিয়া, উহাতে উলিখিত সময়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত কাজ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, যথাঃ–

(ক) উক্ত ভবন, রাস্তা, যন্ত্রপাতি বা প্যান্ট নিরাপদভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা– উহা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নকশা এবং অন্যান্য তথ্য বা বিবরণ সরবরাহ করা;

(খ) কোন নির্দিষ্ট অংশের মান বা শক্তি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং উহার ফলাফল পরিদর্শককে অবহিত করা।

৭৭ বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।--

(১) কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কক্ষ, আঁধার, চৌবাচ্চা, গর্ত, পাইপ, ধূমপথ, অথবা অন্যান্য সীমাবদ্ধ স্থানে, যেখানে বিপজ্জনক ধোঁয়া এই পরিমাণে থাকার সম্ভাবনা আছে, যাহা দ্বারা কোন ব্যক্তির আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকিয়া যায়, কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবেন না বা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না, যদি না সেখানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাপের কোন ম্যানহোল অথবা বাহির হইবার কার্যকর ব্যবস্থা থাকে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন সীমাবদ্ধ স্থানে ২৪ ভোল্টের অধিক ভোল্টেজ যুক্ত কোন বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক বাতি উহার অভ্যন্তরে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যাইবে না এবং যে ক্ষেত্রে কোন ধোঁয়া দাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে ক্ষেত্রে দাহ্য নিরোধক বস্তু দ্বারা নির্মিত বাতি ছাড়া অন্য কোন বাতি উক্ত স্থানে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

(৩) কোন প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কোন সীমাবদ্ধ স্থানে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিবেন না বা প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না, যদি না উহা হইতে ধোঁয়া নিষ্কাশন এবং প্রবেশ প্রতিরোধ ব্যবস্থা করার জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থা গ্রহণ করা হয়, এবং যদি না নিম্নলিখিত যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়–

(ক) কোন উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষান্তে এই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয় যে, স্থানটি বিপজ্জনক ধোঁয়া হইতে মুক্ত, এবং উহা প্রবেশের জন্য উপযুক্ত; অথবা

(খ) সংশ্লিষ্ট শ্রমিক একটি উপযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন এবং তাহার কোমর বন্ধের সঙ্গে এমন একটি রজ্জু বাধা আছে যাহার খোলা প্রান্ত উক্ত স্থানের বাহিরে অবস্থানরত কোন ব্যক্তির হাতে আছে।

(৪) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র, সজ্ঞান করার যন্ত্র, কোমরবন্ধ এবং রজ্জু তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য উক্তরূপ স্থানের নিকটেই মওজুদ রাখিতে হইবে, এবং উক্তরূপ সরঞ্জাম কোন উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সময় সময় পরীক্ষিত হইতে হইবে, এবং উহা ব্যবহারের যোগ্য– এই মর্মে তৎকর্তৃক প্রত্যয়িত হইতে হইবে, এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে উক্তরূপ সরঞ্জাম ব্যবহার এবং শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহ করার পন্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তিকে বয়লার, বয়লারের চুল্লি, ধূমপথ, আঁধার, চৌবাচ্চা, পাইপ অথবা কোন সীমাবদ্ধ স্থানে উহাতে কাজ করার জন্য অথবা উহাতে কোন পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা বায়ু প্রবাহের দ্বারা যথেষ্ট ঠাণ্ডা করা হইয়াছে অথবা অন্য কোনভাবে মানুষের প্রবেশের জন্য উপযুক্ত করা হইয়াছে।

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
বাড়ি # ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১১৬৫৫৩ ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল: bils@citech.net
www.bilsbd.org